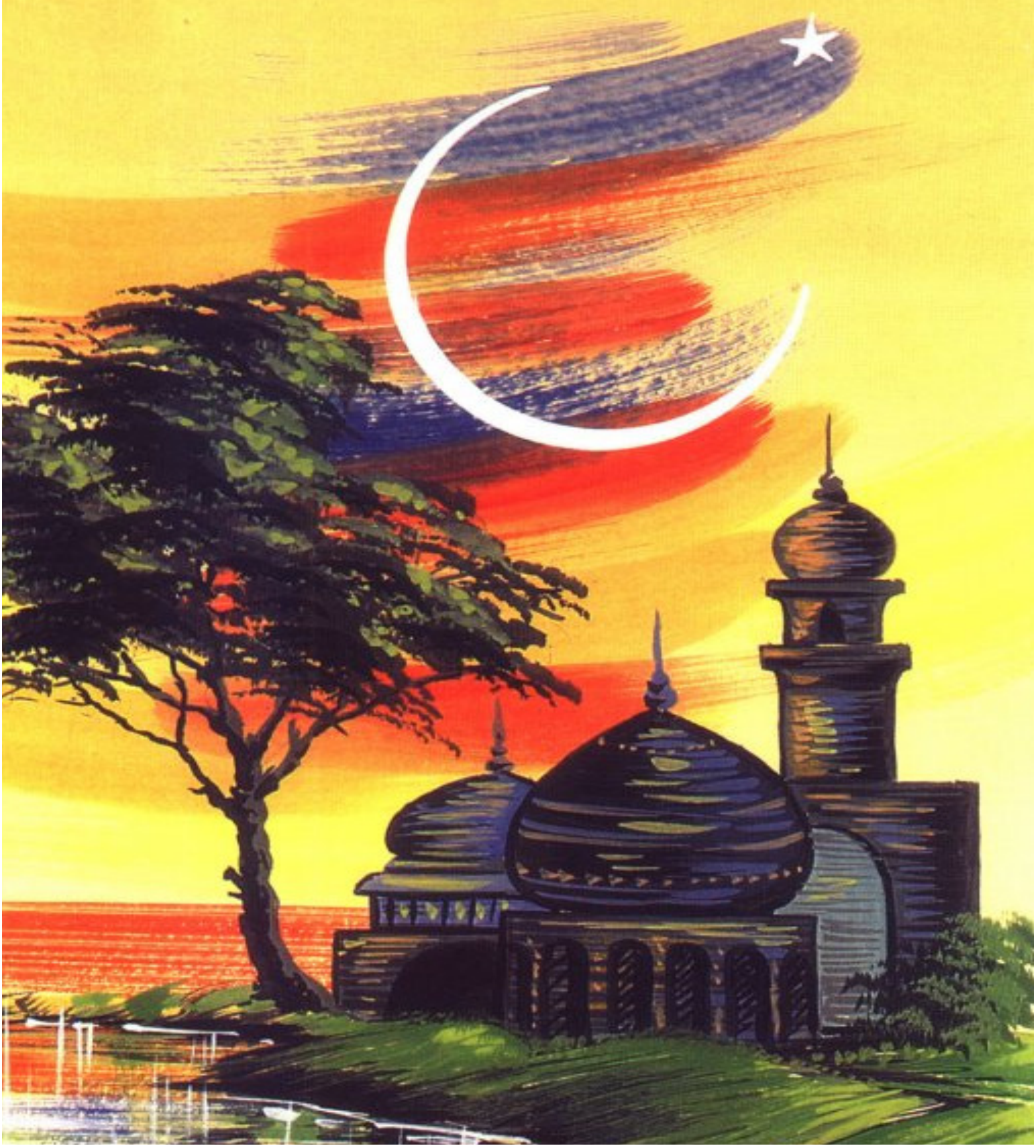

চলন্তিকা

# ঈদ সংখ্যা

# ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাকিদ।।

তোর সোনাদানা বালাখানা সব রাহে লিল্লাহ
দে জাকাত মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙ্গাইতে নিঁদ।।

তুই পড়বি ঈদের নামাজ রে মন সেই সে ঈদগাহে
যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম হয়েছে শহীদ।।

আজ ভুলে গিয়ে দোস্ত দুশমন হাত মিলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরিদ।।

যারা জীবন ভরে রাখছে রোজা নিত- উপবাসী
সেই গরীব মিস্কিন দে যা কিছু মফিদ।।

ঢাল হৃদয়ের তোর তশতরীতে শিরনী তৌহিদের,
তোর দওত করবুল করবেন হযরত, হয় মনে উমিদ।।

তোরে মারল ছুঁড়ে জুড়ে ইঁট পাথর যারা
সেই পাথর দিয়ে তোলরে গ'ড়ে প্রেমেরি মসজিদ।।

-কাজী নজরুল ইসলাম-

চলন্তিকা
ঈদ সংখ্যা
আগস্ট ২০১৩

# সম্পাদকের কথা

আর কয়েকদিন পরই ঈদ। ঈদ মানে ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা। বৃহতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। ঈদ মানে সবাই মিলে সুন্দর থাকা। আমরা চেষ্টা করেছি একটি মানসম্পন্ন ঈদ সংখ্যা আমাদের পাঠকের হাতে তুলে দিতে। সময় স্বল্পতা ও অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য বেশ কিছু ভুল থাকতে পারে। তারপরও আমরা বিশ্বাস করি এটি নতুন লেখকদের সমন্বয়ে দেশের সেরা ঈদ সংখ্যা। আমাদের সব পাঠকের জন্য এই আমাদের ঈদ উপহার। আপনাদের সবার ঈদ সুন্দর হোক, আনন্দময় হোক, নিরাপদ হোক। যে যেখানে আছেন, ভালো থাকুন।

**ঈদ মোবারক!!!**

# সূচীপত্র


**উদ্যোগ**

ঈদে বাড়ি যাচ্ছেন; একটু শুনুন প্লিজ! / **সুমাইয়া বরকতউল্লাহ্ - ৮**

**প্রবন্ধ**

'বনলতা সেন'কে ঘিরে অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন!!! / **এস ইসলাম ২০**

বাকরুদ্ধ **/ আযাহা সুলতান ৩২**

**ছড়া**

খুশীর ঈদ / **আমির হোসেন ৯**

হাওয়াই বাঁশি / **সপ্নিল রায় ১০**

খোকন সোনার ঈদ **/ কে এইচ মাহবুব ১২**

আমার সবুজ পাখি **/ মোঃ শাহীনুর রহমান ১২**

যুবক তুমি **/ আবু আশফাক ২২**

বোনাস / **এ টি এম মোস্তফা কামাল ৪৬**

আজ বাড়ী যাচ্ছি / **রফিক আল জায়েদ ৫৮**

নেশাখোর চোর **/ শহীদুল ইসলাম প্রামানিক ৬০**

হিমুর শোকে লক্ষ হিমু কাঁদে / **মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম ৭১**

**জীবনের গল্প**

জীবন যুদ্ধ!! / **নিজাম মজুমদার নিজু ২৩**

বিয়ে বিয়ে খেলা / **জিল্লুর রহমান ৪৭**

**শিশুতোষ ও শিক্ষণীয়**

রাজার ভেলা / **আলামগীর কবির ৩৫**

**কবিতা**

বুক পকেট **/ এমদাদ হোসেন নয়ন ১০**

মোরা দু'জন **/ শাহরিয়ার সজিব ১৬**

তোমার চলে যাবার পদধ্বনি **/ সালমান মাহফুজ ১৯**

দু:খ দেখেছি / **কাউছার আলম ২৪**

উদ্যানে নাস্তির ফুল **/ নোমান রহমান ২৪**

তোমাকে ভালোবাসব বলে / **কবি বাংলাদেশী ২৫**

শুধু বেঁচে থাকার জন্য নির্মোহ নগর যাপন **/ চারু মান্নান ২৫**

বর্ষার জলে **/ মোসাদ্দেক ৩১**

ভালোবাসা / **মোঃ আমিনুল ইসলাম ৩১**

একি শূন্য দিয়ে শূন্যকে ভাগ **/ শ্যাম পুলক ৩৪**

বাবা / **আরিফুর রহমান ৩৯**

অভিনয় **/ গৌমূমোকৃঈ ৩৬**

মরণের ঘাটি! / **শাহ্ আলম বাদশা ৩৮**

মা যে আমার / **আরিফুর রহমান ৩৯**
কানে গুজেছি একটা হেডফোন / **রূপা ৪৫**
শীতলবালির মাঝে ধুধু নিঃঅন্তর **/ আলমগির সরকার লিটন ৪৪**
আমি কিছু বললে দরজা বন্ধ করে / **মোঃ মোহাইমিন আহমেদ ৪৬**
চির যৌবনা **/ আবদুল্লাহ আল নোমান দোলন ৪৬**
শিরোনামহীন কষ্ট **/ বৈশাখী ঝড় ৪৯**
অনুভব / **মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন আরিফ ৪৯**
প্রিয় বাংলাদেশ **/ পৃথিবী জুড়ে স্বপ্ন ৫৩**
ভালবাসাবাসি **/ আহমেদ ফয়েজ ৬২**

**রসরচনা**
আমে'র যা দাম! / **বদরুল হোসেন ৪০**
আমাদের ফেলুবাবু / **সপ্নিল রায় ৭১**

**গল্প**
শেষ বিকেলের আলো / **মোস্তাক আহমেদ ১৩**
হরিদাসের প্রেম / **শাওন রশিদ ৩৭**
মৃদু দীর্ঘশ্বাস / **জুবায়ের হুসাইন ৪১**
প্রথম কদম ফুল / **আহমেদ ইশতিয়াক ৫০**
তুমি রবে নীরবে - প্রেমের গল্প , দ্রোহের গল্প/ **ফিদাতো মিশকা ৫৫**
তিনি এবং একটি দুঃস্বপ্ন / **মোঃ মাসুদ ফেরদৌস ৫৮**
ঘর / **সাফাত মোসাফি ৫৯**
শশুর বাড়ির পিঠা **/ মোঃ ওবায়দুল ইসলাম ৬১**
চোখের কোনে জল / **তৌহিদ উল্ল্যাহ শাকিল ৭৭**
দিবসহীনদের গল্প, ওরফে চেঙ্গু / **এ হুসাইন মিন্টু ৮০**

**স্মৃতিচারণ**
শৈশবের সেই গান ..... / **সিকদার ১১**

**রহস্য গল্প**
কঙ্কাল / **বিএম বরকতউল্লাহ্ ১৬**

**সাক্ষাৎকার**
হুমায়ুন আহমেদ এর প্রথম সাক্ষাৎকার / **সংগ্রহে আনোয়ার জাহান ঐরি ৬৩**

**বিজ্ঞান কল্পকাহিনী**
ঈশ্বরীয় আবেশ / **মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক খান ৭২**

**পর্যটন**
হিলারি তেনজিং-এর এভারেস্ট জয়ের ৬০ বছর / **সম্পাদক ২৬**
তারুয়া সমুদ্র সৈকত যেন কক্সবাজার-কুয়াকাটাকেও হার মানিয়েছে!!! ৫১
রূপে ঝলমল নিঝুম দ্বীপ / **মোঃ অলিউর রহমান ৫৩**

**অলৌকিক গল্প**
দেওগাঁ'য়ের গণকবর / **অনিকেত আহমেদ ৭৫**

**ইচ্ছেকথা**
যা পারিনি আমি... / **শওকত আলী বেনু ৫৯**

**অণুকাব্য**
বৃষ্টি নিয়ে অণুকাব্য / **অংকুর ৬৩**

উদ্যোগ

# ঈদে বাড়ি যাচ্ছেন; একটু শুনুন প্লিজ!

সুমাইয়া বরকতউল্লাহ্ ৷ *আমি ছাত্রী। লেখালেখি করা আমার ভীষণ পছন্দ। আমি ছড়া, গল্প লিখি। পত্রিকায় নিয়মিত লিখি। ব্লগ আমার কাছে একটা বিশাল লাইব্রেরির মতো। অনেক কিছুই শেখা যায় এখান থেকে। ব্লগ পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। আমি পড়ালেখার ফাঁকে যখনই সময় পাই তখনই ব্লগ পড়ি আর মাঝেমধ্যে লিখি। আমি আশা করি যারা ব্লগে লিখেন তাঁদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারবো। আমার প্রকাশিত বইঃ ১টি। নামঃ "ছোট আপুর বিয়ে।" সাহিত্যকাল প্রকাশনী থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত। শিশু অধিকার রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ (প্রিণ্ট মিডিয়া) পর পর ৩ বার জাতিসংঘ-ইউনিসেফ-এর মীনা মিডিয়া এ্যাওয়ার্ডসহ আরো কিছু পুরস্কার পেয়েছি। প্রাপ্ত পুরস্কার ১. জাতিসংঘ শিশুতহবিল (ইউনিসেফ)-এর 'মীনা মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড' লাভ ২০০৮ (২য় পুরস্কার) ২. জাতিসংঘ শিশুতহবিল (ইউনিসেফ)-এর 'মীনা মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড' লাভ ২০০৯ (২য় পুরস্কার) ৩. জাতিসংঘ শিশুতহবিল (ইউনিসেফ)-এর 'মীনা মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড' লাভ ২০১০ (২য় পুরস্কার) ৪. 'ডানো ভাইটা-কিডস' মাসিক সাতরং-ব্র্যাক-এর গল্পলেখা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার (২০০৯) ৫. ঐতিহ্য গোল্লাছুট প্রথম আলো গল্প লেখা প্রতিযোগিতা ২০০৭-এ অন্যতম সেরা গল্পকার পুরস্কার। ৬. প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলে আয়োজিত লেখা প্রতিযোগিতায় (২০০৭) অন্যতম সেরা লেখক পুরস্কার ৭. প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলে আয়োজিত লেখা প্রতিযোগিতায় (২০০৮) অন্যতম সেরা লেখক পুরস্কার ৮. 'চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি-বগুড়া' এর গল্পলেখা প্রতিযোগিতায় ২য় পুরস্কার(২০০৯) ৯. প্রথম আলোর 'বদলের বয়ান'-এ লেখা প্রতিযোগিতায় (২০০৯) ২য় পুরস্কার ১০. আন্তর্জাতিক শিশু-কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব ২০১০-এ গল্পলেখা পর্বে 'অন্যতম সেরা গল্পকার' পুরস্কার। ১১. কথাসাহিত্য কেন্দ্র পুরস্কার ২০১১ ঢাকা। ২য় পুরস্কার। ১২. ঐতিহ্য গোল্লাছুট গল্পলেখা প্রতিযোগিতা-২০১২ অন্যতম সেরা গল্পকার পুরস্কার।*

আপনি কি ঈদে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন? সবকিছু ঠিকঠাক মতো গুছিয়ে নিয়েছেন তো? আচ্ছা খেয়াল করে দেখুন তো, একটি জিনিস নিতে ভুলে গেছেন কি না!

অনেক জামা-জুতো কিনেছেন এবার। অনেকগুলো টাকাও খরচ করে ফেলেছেন আপনি। অসংখ্য জামা আর জুতুর মাঝে আপনি কি আপনার গরিব প্রতিবেশীর ছেলে বা মেয়ের জন্য একটি ফ্রগ, একটি পেন্ট বা একটি গেঞ্জি কিনে নিয়েছেন তো?

আমি কিন্তু নিয়েছি। আমার দাদাবাড়ির আশেপাশে কয়েকটা গরিব পরিবার আছে। আমার মতো বয়েসের মেয়েও আছে। আমি বাড়ি গেলে ওরা ছুটে চলে আসে আমার কাছে। অনেক অনেক খুশি হয় তারা। সারাদিন আমরা একসাথেই থাকি, খাই, ঘুরি, খেলা করি আর করি অনেক আনন্দ। ওরা দাওয়াত করে। অনেক মজা হয় তখন। সবদিক থেকেই ওদের সাথে আমার মিল আছে। কিন্তু আমি যখন দামী জামা-জুতো পরে ওদের সাথে বের হই তখন আর মিল থাকে না। এ অমিলটার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। তখন আমার খালি মনে হয় আমি ঈদের আনন্দ করতে এসে কি এই গরিব মেয়েদের সাথে প্রতারণা করছি, না ফেরাই দেখাচ্ছি। নাকি ইচ্ছা করে আমি ওদের মনে কষ্ট দিচ্ছি। লজ্জায় আমার মুখটা লাল হয়ে যায়।

তাই আমি টাকা বাচিয়ে ও বাবার কাছে চেয়ে টাকা নিয়ে চারটি মেয়ের জন্য চারটি জামা আর জুতো নিয়েছি। এখন আমার জামার চেয়ে বেশি আনন্দ হচ্ছে ওদেরকে জামার দেয়ার মাঝে। কখন যাব আর কখন ওদের হতে দেব জামা-জুতু। তাদের হাতে জামা-জুতো দেয়ার সময় তাদের মুখটা আনন্দে কেমন চিকচিক করে উঠে সেটা ভাবতেই আমি অনেক আনন্দ পাচ্ছি। দাদু বলেছেন, এ আনন্দই ঈদের আসল আনন্দ, পবিত্র আনন্দ। এ আনন্দ টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় না।

দেখুন, এ কাজটি করতে মোটেও ভুল করবেন না যেন। আপনি যখন বিরাট গাটরিবোচকা নিয়ে বাড়ির উঠোনে পা রাখবেন তখন দেখবেন সেখানে গরিব প্রতিবেশীর ছোট্ট ছোট ছেলে বা মেয়ে উদোম গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি দয়া করে তার দিকে একটিবার তাকিয়ে দেখবেন, অনেক কষ্টের মধ্যেও সে হয়তো আপনার আগমনে খুশি খুশি মুখে আপনার চারপাশে ঘোরাফেরা করছে, আপনাকে দেখছে।

আপনি যদি ঠিক সেই মুহূর্তে তার হাতে একটি নতুন জামা তুলে দিতে পারেন তখন কেমন একটা কাণ্ড ঘটে যাবে একটু ভাবুন তো। সে হয়তো জামাটি নিয়ে প্রাণখোলা একটি হাসি দিয়ে আনন্দে পাড়া মাতিয়ে তুলবে।

আপনার ঈদের আনন্দ-ফুর্তির মাঝে ছোট্ট শিশুটির আনন্দ যোগ হয়ে মহা উতসবের সৃষ্টি করবে। আমরা ইচ্ছা করলেই

কিন্তু সামান্য কিছুর বিনিময়ে ঈদের আনন্দকে মহা উতসবে পরিণত করে ফেলতে পারি। আমরা যেন কেউ এ পবিত্র আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হই। আপনার ঈদ হোক আনন্দময়।

মন্তব্য থেকে

*আসমা নজরুল: আপনার দাদু ঠিকই বলেছেন। সুন্দর উদ্যোগ।*
*মিলন বনিক: ঈদের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে এরকম একটি মানবিক আবেদনের বিকল্প নেই...প্রিয় সুমাইয়াকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা...ঈদ সবার জন্য বয়ে আনুক অনাবিল আনন্দ....*
*কাউছার আলম: সুন্দর উদ্যোগ।*
*আরিফুর রহমান: সুন্দর উদ্যোগটি আমার কাছে খুব ভাল লাগল। এটি পরে আমার চোখের পানি চলে আসল। আমাদের সবারই আপনার মত উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।*
*আমির হোসেন: খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আশা করি সবাই যার যার সামর্থ অনুযায়ী এই ঈদে গরীব দু:খীকে অনন্ত একটি জামা উপহার দিবে।*
*এ হুসাইন মিন্টু: অনেক সুন্দর লেখা, আর লেখার কথাগুলো সত্য হয়, অনেক সুন্দর উদ্যোগও বলা যায়,. নিজের দুঃখ কষ্ট তো পশুও বুঝতে পারে, অন্যেরটা বুঝে কেবল মানুষ,. আসুন আমরা আসল মানুষ হই,. ধন্যবাদ লেখিকাকে।*
*সাফাত মোসাফিঃ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ।*
*আহমেদ ফয়েজঃ ধন্যবাদ সুমাইয়া। লেখাটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। প্রতি ঈদের আগেই এই বিষয়টি আমাদের মনে রাখা উচিত।*
*জিল্লুর রহমানঃ অনেক ভালো লাগল। ধন্যবাদ।*

ছড়া

## খুশীর ঈদ

আমির হোসেন ๒ *লেখালেখি আমার পেশা নয়, নেশা। ১৯৯৭ সালে নবম শ্রেণীতে অধ্যায়নরত থাকালীন সময় থেকে আমার লেখালেখির হাতেখড়ি। সেই থেকে আজ অবধি অবিরাম লিখেই যাচ্ছি। কখনো থেমে থেমে আবার কখনো একনাগারে। লেখতে লেখতে নাকি লেখক হওয়া যায়। তাই অবিরত লিখতে আছি। জানিনা কতদুর যেতে পারব। আমার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ২০০০ সনের জুন মাসে 'মাসিক চিকিৎসা সাময়িকীতে'। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি বিভিন্ন স্থানীয় পত্রিকা, মাসিক ম্যাগাজিন, দৈনিক পত্রিকা, কিশোর পত্রিকা ও বিভিন্ন ব্লগে লেখালেখি করে আসছি। এ পর্যন্ত আমার তিনটি উপন্যাস প্রকাশ হয়েছে। আমি চাই আমার প্রতিটা লেখা আমার পাঠক/পাঠিকারা পড়ুক এবং গঠনমূলক সমালোচনা করুক। কারণ আমি গঠনমূলক সমালোচনা পছন্দ করি।*

ঐ আকাশে চাঁদ উঠেছে
কাল যে হবে ঈদ,
এই খুশীতে সব শিশুদের
নেই যে চোখে নিঁদ।

কেউ বা যাবে বেড়াতে
নানা-নানীর বাড়ি,
তাইতো সবাই কাপড় নিয়ে
করছে কাড়াকাড়ি।

ঈদগাহেতে গিয়ে সবাই
করবে কুলাকুলি,
প্রতিজ্ঞা করবে তারা
আজ থেকে সব বিবেদ ভুলি।

মন্তব্য থেকে

*আলমগীর সরকার লিটন: সুন্দর হয়েছে ছড়া অভিনন্দন*
*আরিফুর রহমান: আপনার ঈদের কবিতা ভীষণ ভাল লাগল। না! বানানে তেমন কোন ভুল ধরা পড়ল না তবে 'নেই যে চোখে—নিঁদ— নিদ মানে বুঝলাম না। ধন্যবাদ!! চালিয়ে যান।*
*আহমেদ ইশতিয়াক: মাত্রার দিকে একটু খেয়াল করবেন ভাই। তবে ছড়ার ভাষার কাঠামো বেশ চমৎকার।*
*এ হুসাইন মিন্টু: সুন্দর ছড়া*
*কাউছার আলম: সুন্দর ছড়া, ঈদের খুশির সাথে মিলবে ভাল।*
*আসমা নজরুল: ঈদের খুশী সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক। আপনার ছড়াটি অনেক অনেক ভাল লেগেছে। ঈদ নিয়ে আরো ছড়া চাই।*

কবিতা

## বুক পকেট

এমদাদ হোসেন নয়ন

আজ মন ভালোবাসার বৃষ্টি ঝরাবে
আকাশের নীল জল দিগন্ত ছুঁয়ে
তোমার হৃদয়ে হারাবে-
শূন্য পৃথিবীর বুকে ভালোবাসার ঘর বাঁধবে।

দুচোখের সীমানা ছুঁয়ে তুমি আসবে
হৃদয়ের সব বিষন্নতা মাড়িয়ে
আমি সুখের চাদরে জড়াবো তোমাকে।

আজ স্বপ্নরা ভিড় করবে দুচোখে
প্রকৃতির সব বিষন্নতা শেষ হবে কবে?
সব ভালোবাসা জমা থাক তোমার পাঁজরে।

আমি দুলছি তোমার অনুভবের দোলনায়
রেখো আমায় তোমার কল্পনায়,
তোমার ডালিম পাকা ঠোঁটের মিষ্টি হাসি
আমার বুক পকেটে জমা থাক দিবানিশী।

মন্তব্য থেকে

*আরিফুর রহমান: বুক পকেটে জমা কতদিন রাখবেন . . .*
*এ হুসাইন মিন্টু: সুন্দর কবিতা, নিয়মিত লিখে ও অন্যের লেখা পড়ে গঠনমূলক মন্তব্য করে ব্লগকে প্রাণবন্ত করে তলুন,*
*সাফাত মোসাফি: খুব সুন্দর।*
*শাহরিয়ার সজিব: ভাই আপনার বুক পকেটে হাসি জমা রাখা যায় ?*

ছড়া

## হাওয়াই বাঁশি

সপ্নিল রায় ๗ *আমি স্বপ্নিল, ভালবেসেছি এই মাটিকে আর ভালবেসেই যাবো।*

সেই যে সেদিন ইশকুলেতে
ভর্তি হলাম যবে
সব যে আমার মনের খাতায়
ডায়রি হয়ে রবে।
বিকেল হলে পাড়ার সব ছেলেমেয়ের দল
চারদিকে সব হুটোপুটি
খেলবি কে আয় চল।
দিন পেরিয়ে আজো মনে
কানামাছির খেলা
হাওয়াই বাঁশি , ঢোলের সাথে
দুর্গাপূজার মেলা।

মন্তব্য থেকে

*আমির হোসেনঃ ভাল লাগল। লিখুন প্রতিদিন।*
*আরিফুর রহমানঃ আপনার ছড়াটা খুব ভাল লাগল ভাই।*

বিজটেনর আসছে ...

স্মৃতিচারণ

# শৈশবের সেই গান .....

সিকদার

শৈশবে যখন গ্রামে ছিলাম তখন আমার চারপাশে জ্যাঠাত ভাই-বোনেরা ছিল । আমার ছোট ফুপু ও তার বান্ধবীরা তখন সতের আঠার বছর বয়স হবে । ওদের মুখেই শুনতাম গান। আমার ছোট ফুপু প্রায় একটা গান গাইতঃ
গুন গুনাগুন গান গাহিয়া নীল ভ্রমরা যায়,
গানের তালে মন আমার উছলায় উছলায়।

আরেকটা গান এখনও মনে পড়ে ..... আগুন জ্বলেরে আগুন নিভানোর মানুষ নাই .....।

এগুলোই ছিল তখন বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় গান।

আমার বড় জ্যাঠাত ভাইয়ের মুখে তখন একটা গান শুনতাম ..

মাগো মা ওগো মা আমরে বানাইলি তুই দিওয়ানা ,
আমি যেতে পারি দুনিয়া ছাড়ি ,
তোকে আমি ছাড়বনা মাগো ,
তোকে আমি ছাড়বনা
মাগো মা ওগো মা আমরে বানাইলি তুই দিওয়ানা ।

গ্রামে গ্রীষ্মের কাঠ ফাটা রোদে যখন পুকুর খাল বিল শুকিয়ে যেত তখন চারদিকে পানির জন্য হাহাকার শুরু হয়ে যেত। বড়রা মাঠে কড়া রোদের মধ্য খোলা মাঠে উপর বৃষ্টির জন্য নামায পড়ত । তখন নামায শেষে গায়ের পড়নের জামা উল্টিয়ে পড়ত তারপর দুই হাত যতটুকু উপরে উঠানো সম্ভব ততটুকু উপরে উঠিয়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করত । এতে দেখেছি প্রায় সময় আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামত।

এদিকে গ্রামের তরুন তরুনীরা গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে যেয়ে চাল, মিঠাই, মসলা চেয়ে নিত। তরুনরা সেগুলি রান্না করে সিন্নি পাকাত । তরুনীরা নতুন শাড়ি পেচিয়ে পড়ত । আচলটা কোমড়ে গুজে কোমরে পানি ভরা কলসি নিয়ে নাচত আর গান গাইত

আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ,
ছায়া দেরে তুই আল্লাহ মেঘ দে .....।

নাচের তালে তালে কলসি থেকে পানি পড়ত আর সেই পানি যেখানে মাটিতে পড়ত, সেখানে কয়েকজন তরুনী দুই হাতে মাটি লেপত আর গান গাইত। তারপর নাচ গান শেষ হলে চলত সিন্নি খাওয়ার ধাক্কাধাক্কি । আমরা যার যার কলা পাতা ছিড়ে নিয়ে আসতাম। সেই কলা পাতা সামনে রেখে মাটিতে বসতাম । তরুনরা পাকানো সিন্নি সেই কলা পাতায় ঢেলে দিত আমরা মজা করে খেতাম।

আমার ছোট এক জ্যাঠাত ভাই ছিল ছোটকালে তার স্বভাব ছিল পস্রাব খাওয়া । জানি না এই পস্রাব খাওয়ার কারনে নাকি এমনিই ও কথা বলত "ড" উচ্চারনে । তার ড উচ্চরনে কথা গুলি শুনতে আমরা খুব আনন্দ পেতাম । তাই আমি প্রায় ওকে বলতাম উজ্জল একটা গান গাত। ও তখন গাইত ...

কামেলেডা কাম কডিয়া কোডায় জানি লুকাইডে ,
ডো পাহাডের মাডে মাওলা মডডিড বানাইডে।
ওর এই গান শুনে আমরা হাসতে হাসতে পড়ে যেতাম ।

আমরা যখন চট্টগ্রাম শহরের মোগলটুলিতে থাকতাম তখন সেখানে একজন বৃদ্ধ ফকির আসতেন । ছোটখাট গড়নের হ্যাংলা পাতলা মানুষ ছিলেন । তার হাতে একটা লাঠি থাকত । তিনি যখনই আমাদের বাসায় সামনে আসতেন তখনই আমরা দুই ভাই তার সামনে এক মুঠো চাল নিয়ে হাজির হয়ে বলতাম ঐ গানটা গান না।

তিনি হাতের লাঠিটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে গাইতেন ..।

চেপে চেপে দেব মাটি ,
চেপে চেপে দেব মাটি নিদয়ও হইয়া ।
মরন কালে ভুলিয়া যাবি এই দুনিয়ার মায়া।
চেপে চেপে দেব মাটি ,
চেপে চেপে দেব মাটি নিদয়ও হইয়া ।

সেই অনেক দিন আগের কথা । আজ কালের প্রহরে পেরিয়ে গেছে আঠাশ-ত্রিশ বৎসর । আজ কবরের কথা মনে করিয়ে দেওয়া সেই ফকির এতদিনে আর দুনিয়াতে নাই । কবেই কোন অজানা সময়ে তাকে দাফন করা হয়ে গেছে । দাফনকারীরা তার কবরে দিয়েছে মাটি চেপে চেপে নিদয়ও হয়ে । আমাদেরও একদিন চলে যেতে হবে । কত জনাইত ছিল , মা ছিল বাবা ছিল দাদা-দাদী ছিল । কোথায় আজ

তারা ? কবরের বাসিন্দা হয়ে কেয়ামতের প্রহর গুনছে।
আল্লাহ সেই ফকিরকে বেহেশত নসীব করুক।

মন্তব্য থেকে

*এ হুসাইন মিন্টুঃ সুন্দর, নিয়মিত লেখুন,*
*আমির হোসেনঃ স্মৃতিচারণটি ভাল লাগল।*
*আরিফুর রহমানঃ স্মৃতিচারণটি বেশ লেগেছে।*

ছড়া

## খোকন সোনার ঈদ

কে এইচ মাহবুব

রোযা শেষে চাঁদের রাতে
ডাক দিয়ে যায় পাখি,
জেগে উঠো খোকন সোনা
দেখো খুলে আঁখি ।
পূবের আকাশ লাল হয়েছে
সূরুজ উঠেছে ঐ,
ডাকছে তোমার আপনজন
ডাকছে তোমার সই ।

গোসল করবে কখন তুমি
কখন সেমাই খাবে,
কখন করবে কোলাকুলি
কখন নামাজে যাবে ।

মন্তব্য থেকে
*আহমেদ ইশতিয়াক :ঈদের জন্যে সুন্দর একটি ছড়া। শুভেচ্ছা রইল...*
*আমির হোসেন :ঈদের জন্য চসৎকার একটি ছোটদের উপযোগী ছড়া লিখলেন।*
*আরিফুর রহমান :সুন্দর একটি ছড়া ঈদ নিয়ে।*

ছড়া

## আমার সবুজ পাখি

মোঃ শাহীনুর রহমান

সবুজ ঘাসে ছাওয়া ছিল
তার সারাটা গাঁ
হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল
আমায় দিয়ে ঘাঁ।

লাল টুকটুকে ঠোট খানি তার
ডাকতো আমায় নানা
সারাটা দিন ঘরটায় যেন
সুর দিত তার হানা।

পাখি তো নয় লক্ষ্মী ছিল
ঘরটা আলোয় জ্বেলে
যেদিকে যাই সাথেই যেত
যাদুর পাখনা মেলে

আম পেঁয়ারা জাম খেত খুব
খেত কথার লাজ
অচেনা লোক দেখলেই সে
ছাড়তো কথার বাজ।

নাম কী তোমার কোথায় থাক
কেনবা এলে হেথায়?
বিষিয়ে তুলতো আগুন্তককে
এমনি হাজার কথায়।

কখনো বা ছিচঁকে চোরে
পড়তো কথার প্যাঁচে
লেজ গুটিয়ে দৌড় দিলে
পাখি উঠতো নেচে।

সোনার পাখি টিয়া আমার
ছোট্ট বেলার সাথী
চোখের জলে ভাসিয়ে আমায়
নিভিয়ে গেছে বাতি।

পথ চেয়ে তার কৈশোর আমার
কেটেছে আশায় আশায়
গাছের ডালে খালে বিলে
খুঁজে পাখির বাসায় ।

হারিয়ে যাওয়া সবুজ পাখি
সবুজ পাখার ঘ্রাণ
স্বপ্নে আজো সঙ্গী করে
ভরাই দুখের প্রাণ।

মন্তব্য থেকে

*আমির হোসেন: আপনার লেখাটা ভাল লাগল।*
*আসমা নজরুল: আশা করি সঠিক ক্যাটাগরি দিয়ে দিবেন। ভাল লাগল।*
*এ হুসাইন মিন্টু: আপনার কবিতাটি আমার কাছে ভালো লেগেছে ।*
*আহমেদ ইশতিয়াক: ফরম্যাটটা তো ছড়ার। তবু উল্লেখ করে দিলে ভালো হত।*
*আরিফুর রহমান: আপনাকে চলন্তিকায় স্বাগতম,আপনার ছড়াটা বেশ লেগেছে। ভালো থাকবেন।*
*কাউছার আলম: আপনার লেখাটা ভাল লাগল।*

গল্প

## শেষ বিকেলের আলো

মোস্তাক আহমেদ ✍ *বই পড়তে ও স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি । পেশায় ছাত্র শিক্ষক দুটোই। মাস্টার্স করছি এবং একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে আছি ৯-১০ মাস হল। সাহিত্যের কিছু বুঝি না। যা ভালো লাগে তাই পড়ি। অনেক অনেক কিছু লিখতে ইচ্ছে হয়। কত-শত মানুষ, কত হাসি, কত গান, কত দুঃখ! কিন্তু হায়, লেখক হিসেবে আমার ক্ষমতা খুবই সীমিত।*

প্রচণ্ড মাথা যন্ত্রণা করছে। মাথার বাম পাশের শিরাটা দপদপ করে লাফাচ্ছে। মনে হচ্ছে লাফাতে লাফাতে যে কোন সময় ছিঁড়ে বের হয়ে আসবে। দুটো মাইগ্রেনিল ৫০০ মিলিগ্রাম খেয়ে ফেললাম। ওষুধে কিছু হয় না। শুধু কেমন জানি দুর্বল, আচ্ছন্ন ভাব আসে। কিন্তু ব্যাথা কমে না। কোন ডাক্তারই আজ পর্যন্ত আমার মাথা ব্যাথা কমাতে পারে নি। শুধু সাবু পারতো। সাবু আমার ছোটবেলার বন্ধু। আমার সারাজীবনের সবচে ভাল বন্ধু। একদম প্রাণের বন্ধু।

ছোটবেলা থেকে আমার মাইগ্রেনের সমস্যা। যখন ব্যাথা শুরু হত তখন পাগলের মত হয়ে যেতাম। তখন যশোর জিলা স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ি। একদিন এরকম মাথা ব্যাথা শুরু হলে সাবু বিরক্ত হওয়ার ভান করে বলল,

‘তোরে নিয়ে তো ভাল যন্ত্রণা। মাথা ব্যাথার দেখি কোন ইস্টিশন নাই।‘

আমি কিছু না বলে মাথার বাম দিকের শিরাটা চেপে ধরে সিঁড়িতে বসে পড়ি। আমার কথা বলার মত অবস্থা নেই।

‘দাঁড়া, তোর মাথা ব্যাথা কমিয়ে দিচ্ছি।‘

‘কিভাবে?’ কোনমতে বলি।

সাবু তখন আমার পাশে বামদিকে বসে ওর মাথাটা আমার মাথার সাথে চেপে ধরে।

‘এই দ্যাখ, আমি তোর মাথা ব্যাথা নিয়ে নিচ্ছি। তুই শুধু চিন্তা করতে থাক যে তোর ব্যাথা কমে যাচ্ছে। তোর ব্যাথা আমার মাথায় চলে আসছে।‘

আমি চোখমুখ কুঁচকে স্বার্থপরের মত সাবুর মাথায় আমার - ব্যাথা পাঠানোর চেষ্টা করতে থাকি। মিনিট দুয়েক পর সত্যিই আমার ব্যাথা কমে গেল।

‘ব্যাথা কমে গেছে।‘

‘দেখেছিসবলেছিলাম না !?’ সাবুর মুখে যুদ্ধ জয়ের হাসি।

‘এখন তোর মাথা ব্যাথা করছে না?’

‘মাথার ডান পাশটা একটু চিন চিন করছে।‘

‘তোর কি কষ্ট হচ্ছে?’

‘দূর। এইটুক ব্যাথাট্যাতায় আমার কিছু হয় না।-‘

ওর আসলেই কিছু হয় না। গাঁট্টাগোট্টা, শক্তিশালী শরীর। সে তুলনায় আমি নেহায়েতই দুবলা। মাথা ব্যাথা কমানোর এই পদ্ধতি আমরা এরপরও অনেক বার প্রয়োগ করেছি। সব বারই কাজ করেছে।

সাবুর হাতের লেখা আর আমার হাতের লেখা একই রকম ছিল। আমরা দুজন পিছনের দিকে একটা বেঞ্চে একসাথে বসতাম। তখন বাংলা ক্লাসে প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা করে হাতের লেখা দেখাতে হত। মকবুল স্যার সামনে থেকে খাতা দেখতে দেখতে আসতেন আর যে হাতে লেখা আনে নাই তার হাতে মোটা বেতের প্রচণ্ড বাড়ি। ছাত্র হিসেবে আমি মোটামুটি ভাল, কিন্তু খুব ভুলোমনা ছিলাম। মাঝে মাঝেই লেখা নিয়ে যেতে ভুলে যেতাম। আমি যখন ব্যাপারটা আবিষ্কার করে টেনশনে অস্থির হয়ে যেতাম তখন সাবু আমার খাতা নিয়ে লিখতে শুরু করত। স্যার কাছে আসতে আসতেই ওর লেখা শেষ! প্রচণ্ড দ্রুত লিখতে পারতো সাবু।

একদিন তো এমন হল যে ও আমারটা লিখে দিয়েছে কিন্তু ঐদিন ও নিজের লেখাটাই লেখে নি। ওর উপর রাগ করেছিলাম খুব। সেটা বলতেই,

'তুই মার খেলে আমার খুব খারাপ লাগে।'

'তাই বলে নিজে মার খেয়ে আমাকে বাঁচাবি!'

'ওরকম একটাদুটো মারে আমার কিছু হয় না।-' সাবু দাঁত কেলিয়ে হাসে।

'এরপর থেকে আর কখনো এরকম করবি না। করলে কিন্তু.....'

'ঠিক আছে যা, আর এরকম করব না।' সাবু হাত দিয়ে বিষয়টা উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে।

আসলে ব্যাপারটা আমার প্রেস্টিজে লেগেছিল। সবসময় সাবুই আমার জন্য করবে – ব্যাপারটা আমার ভাল লাগত না। ওর জন্য কিছু করতে ইচ্ছে হত। মনে হত ওর জন্য জীবন দিয়ে দিই। মনে হত, এমন কোন ঘটনা ঘটুক যে আমি আমার জীবন দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে দিই। তাহলে সাবু বুঝতে পারত যে আমি ওকে কতটা ভালবাসি।

সেদিনের কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। টিফিন পিরিয়ড। এর পরে সমাজ ক্লাস। সাবু বলল, 'চল, একটা খাতা কিনে আনি। স্যার সমাজের জন্য আলাদা খাতা বানাতে বলেছে। আমার এখনো কেনা হয় নি।'

আমি হোমওয়ার্কটা একটু দেখে নিচ্ছিলাম। ওকে বললাম, 'একটু দাঁড়া। যাচ্ছি। এক মিনিট।'

'আচ্ছা, তুই থাক। আমি এক দৌড়ে যেয়ে কিনে আনি।'

এই বলে সাবু ওর প্রিয় 'স্যানসি' সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দোকানটা স্কুলের বাইরে। আমাদের স্কুলের পাশে বড় রাস্তা। বেশ ব্যাস্ত রাস্তা। সাবু সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা গরু ওর সাইকেলে শিং দিয়ে গুতা দিল। সাবু ছিটকে পড়ল রাস্তার মাঝের দিকে। ঠিক সেই সময় একটা বিশাল ট্রাক ওর উপর দিয়ে চলে গেল। ট্রাকের টায়ারের নিচে পড়ে 'ফটাশ' শব্দ করে সাবুর মাথার খুলি ফেটে গেল। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল একগাদা রক্ত, মাথার ঘিলু। লাল টকটকে তাজা রক্ত।

খবর পেয়েই আমি দৌড়ে ছুটে গেলাম। এই দৃশ্য দেখে আমার হিস্টিরিয়ার মত শুরু হল। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। সাবুর পুরো নাম সাহাবুদ্দিন মিয়াঁ । নামের 'মিয়াঁ' অংশটা ওর খুব পছন্দ ছিল। কোন কারণে কোথাও আমি 'মিয়াঁ' লিখতে ভুলে গেলে ও রাগ করত। ক্রিকেট খেলতে যেয়ে রানের হিসেব রাখার সময়ও ওর পুরো নাম লিখতে হবে। মিয়াঁ যেন বাদ না পড়ে। 'মিয়াঁ' নামটা আমার খুব একটা পছন্দ ছিল না। একটু খ্যাত মনে হত। আমি ওকে পছন্দের কারণ জিজ্ঞেস করলে ও বুক ফুলিয়ে বলল, 'আমি আমাদের বংশের বড় ছেলে। আমার আপন বোন থেকে শুরু করে চাচাতফুফ-াত সব ভাইবোন আমাকে- মিয়াঁ ভাই ডাকে'। বলতে বলতে গর্বে ওর চোখ চক চক করে ওঠে।

তা সত্যিই ওর ভেতর বড় ভাই সুলভ অনেক ব্যাপার ছিল। মাঝে মাঝে মনে হত ও বুঝি আমারও বড় ভাই। ছোটবেলায় আমি মুখচোরা, লাজুক ধরনের ছেলে ছিলাম। চারপাঁচ - জনের ভিড়ে কোন কথায় বলতে পারতাম না। সাবু আমার এই ঘাটতি পুষিয়ে দিত। আমাকে বুক দিয়ে আগলে রাখত। আমি একটু দুর্বল প্রকৃতির ছিলাম। কোন ছেলে যদি আমাকে মারত বা কিছু করত তাহলে সাবু আমার হয়ে প্রতিশোধ নিত। একবার এক ছেলেকে গাছের ডাল ভেঙে এমন মার মারল যে ব্যাপারটা হেডস্যার পর্যন্ত গড়াল। হেডস্যারকে আমরা খুব ভয় পেতাম। বিশাল শরীর, মেঘের গর্জনের মত গলার স্বর। হেডস্যার একটা মোটা ছয় নম্বুরী বেত নিয়ে সাবুর সামনে দাঁড়িয়ে হুংকার দিলেন,

'তুই ওকে মেরেছিস কেন?'

'ও যে দীপুকে ইট ছুড়ে মারল।'

'ও দীপুকে মেরেছে তো তুই ওকে মারলি কেন?'

'দীপু আমার ভাই।'

উত্তর শুনে স্যার একটু অবাক হলেন। তারপর আমাকে, সাবুকে আর ঐ ছেলেটাকে যার নাম রাকিব – তিনজনকে ডেকে নিয়ে তিনজনকেই পেটালেন। আমার কোন দোষ না থাকলেও সেদিন মার খেয়ে খুব খুশি হয়েছিলাম। সাবু একা মার খেলে খুব কষ্ট হত। আসল ঘটনা তেমন কিছু ছিল না। কী কারণে জানি রাকিব রেগে যেয়ে আমার দিকে একটা ছোট ইটের টুকরা ছুড়ে মারে। ওটা আমার কপালে লেগে একটু কেটে যায়। আমার রক্ত দেখে সাবু খেপে পাগল হয়ে গেল। তারপরে এই ঘটনা।

আমিও সাবুর রক্ত দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। সত্যিকারের পাগলই বোধহয়। সাবু বেঁচে থাকতে যেরকম তাজা, সতেজ ছিল, ওর রক্তও ছিল সেরকম তাজা। তাজা, চাপ চাপ রক্ত রাস্তায় ছড়িয়ে আছে। আর তার মাঝে যশোর জিলা স্কুলের সাদা শার্ট, সাদা প্যান্ট স্কুল ড্রেস পরা ছেলেটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। শার্টটা রক্তে মাখামাখি হয়ে প্রায় লাল হয়ে গেছে। আজ সকালে যদি ও এই ড্রেস পরে স্কুলে আসত তাহলে অ্যাসেম্বলিতে নির্মল স্যারের হাতে মার খেত খুব। নির্মল স্যার আমাদের ড্রিল স্যার। সবাই ঠিকমত স্কুল ড্রেস পরে এসেছে কিনা সেদিকে স্যারের কড়া নজর।

এই ঘটনার পর আমার মানসিক কোন সমস্যা হয়েছিল। স্কুলে এক বছর লস দিয়েছিলাম। এই সময়টার কোন কথা আমার ঠিক মনে নেই।

যেকোন খেলাধুলায় সাবু ছিল দুর্দান্ত। আর আমি পুরো উল্টো, একেবারে যাচ্ছেতাই। এর জন্য আমার যেন কোন অসুবিধা না হয় তাই ও সবসময় আমাকে ওর দলে নিত। কখনও যদি ভাগাভাগির সময় আমি অন্য দলে চলে যেতাম তখন ও আমাকে ওর দলে নেওয়ার জন্য ঝগড়াঝাঁটি শুরু করে দিত। ঝগড়াঝাটিতে কাজ না হলে ব্যাটবল- নিয়ে বাড়ি চলে যাওয়ার ভয় দেখাত। আমাদের খেলার মাঠ ওর বাড়ি থেকে কাছে হওয়ায় সাধারণত ওর ব্যাটবল দিয়েই খেলা - হত। তাই এই ভয় দেখানোতে কাজ হত খুব।

সাবু খেলাধুলাতে যতটা দুর্দান্ত ছিল, পড়াশোনায় ঠিক সে পরিমাণ দুর্বল ছিল। পড়াশোনা নিয়ে সাবুর অবস্থা অনেকটা কৌতুকের সেই ছেলেটার মত যার 'পাস তো দূরের কথা, ফেল নিয়েই টানাটানি' অবস্থা। আমি মাঝে মাঝে সাবুকে পড়াতাম। দুজনে মিলে চেষ্টা করতাম যেন ওকে কোনমতে পাস করান যায়। বেশিরভাগ সময়ই কানের পাশ দিয়ে গুলি যেত।

প্রতিবার রেজাল্ট দিত আর রেজাল্ট কার্ড হাতে নিয়ে বলত, 'আজ আমার বাপ আমারে ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে পেটাবে।' বলার ভঙ্গীতে কোন দুঃখ থাকত না বরং শুনতে মজা লাগত।

'ঝোলানোর পর কি ফ্যান চালিয়ে দিয়ে পেটাবেন নাকি এমনিই পেটাবেন?'

'কে জানেমেজাজ বেশি খারাপ থাকলে চালিয়েও দিতে ! পারে।'

সাবুর বাবা ব্যবসায়ী মানুষ এবং যথেষ্ট বদমেজাজী। আমি পারতপক্ষে এই লোকের সামনে পড়তে চাইতাম না।

আরেকবার রেজাল্ট কার্ড হাতে নিয়ে বলল,

'আজকে আমার বাপ আমারে নিয়ে ফুটবল খেলবে।'

সাবুর বাবা সাবুকে বল বানিয়ে ফুটবল খেলছেন চিন্তা করে আমি খুক করে হেসে ফেলি।

'আমার মার খাওয়ার কথা শুনে তুই হাসছিস!' সাবু আহত হওয়ার ভান করে।

তা সাবু মার খেত বেশ। ও যে রকম দুরন্ত ছেলে তাতে স্কুলে, বাসায় একটু মার খাবে সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। সাবু মার খেতেও পারত খুব। মেরে সাবুকে কাবু করা মুশকিল। ব্যাথা যেন কম লাগে সে জন্য ও নানা ধরনের ব্যবস্থা নিত। ওর একটা মখমলের প্যান্ট ছিল। ওটার ভেতর দিকের কাপড়টা মোটা, অনেকটা বস্তার মত। যেদিন ওর মার খাবার সম্ভাবনা ছিল সেদিন ভেতরে একটা হাফপ্যান্ট পরে ওর উপর এই প্যান্টটা পরে থাকত। ঐ প্যান্টের উপর বেত দিয়ে মারলে শব্দ হত খুব কিন্তু বেশি ব্যাথা লাগত না। তার উপর ও অনেক কৌশল জানত। পাছায় বেত দিয়ে বাড়ি মারলে ঠিক কোন সময়, কিভাবে পাছাটা সামনের দিকে সরিয়ে আনলে ব্যাথা কম লাগবে – ওর থেকে ভাল আর কেউ জানত না।

সাবুর সাথে আমার কোন রক্ত সম্পর্ক নেই, কিন্তু সাবু আমার ভাই। আমার শুধু মনে হয়, ঐ দিন কি আমি ওর সাথে খাতা কিনতে যেতে পারতাম না? কী স্বার্থপরের মত আমি আমার হোমওয়ার্ক দেখছিলামআমরা এমন কি হতে পারত না যে ! দুজন একসাথে খাতা কিনতে গেলাম। গরুটা দেখে আমি সাবুকে সতর্ক করে দিলাম। তারপর দুজনে সাইকেল থেকে নেমে হেঁটে গরুটা পার হলাম। তারপর দোকান থেকে খাতা কিনে স্কুলে ফিরে আসলাম। এরকম হলে কার কী ক্ষতি হত? ও আল্লাহ, তুমি কেন এরকমটা করলে না!

অসহ্য মাথা যন্ত্রণায় আমার মনে হতে থাকে মাথাটা কেটে ফেলি। দুই হাত দিয়ে মাথা ধরে বসে ফিসফিস করে বলি, 'সাবু, তুই আমার ব্যাথা কমিয়ে দে। আর কখনও তোকে একা ছাড়ব না। তুই দেখিস, এর পরেরবার আমি ঠিক তোর সাথে যাবো'।

মন্তব্য থেকে

*গৌমুমোকৃঈঃ বেশ ভালো লাগল গল্পটা। শুভকামনা।*
*আরিফুর রহমানঃ গল্পটা খুব ভাল লেগেছে। ধন্যবাদ।*
*এ হুসাইন মিন্টুঃ পড়লাম, বন্ধত্বের গাঢ়তা ভালো ভাবে ফুটে ওঠেছে।*
*সাফাত মোসাফিঃ খুব ভাল লেগেছে।*
*কাউছার আলমঃ বেশ ভালো লাগল গল্পটা। শুভকামনা।*

বিজটেনর আসছে ...

কবিতা

## মোরা দু'জন

শাহরিয়ার সজিব

মোরা দু'জন
চলো যাই, চলো যাই
অচেনা এক শহরে,
পদ্ম ঘাঠ পেরিয়ে,
বহু গ্রাম ছারিয়ে,
নতুন এক শহরে,
মোরা দুজন চলে যাই।
যেথায় থাকবে না বাধা
যাব মোরা সেথা।
আর আসলে আসুক বাধা
আমাদের থাকবেনা কোন ভয়,
সব কিছুকেই করব জয়
গাইব জয়ের গান
শান্ত হবে তোমার আমার প্রাণ।।

মন্তব্য থেকে

*আরিফুর রহমানঃ শাহরিয়ার সজিব ভাই কবিতাটি মোটামুটি ভাল লেগেছে। কিন্তু দাড়িঁ কমার মিল রাখলে আরো ভাল হত। চালিয়ে যান। ধন্যবাদ।*
*আরিফুর রহমানঃ আপনাকে ও ধন্যবাদ। নিয়মিত লিখবেন। চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। আমরা আপনার সাথে আছি। ধন্যবাদ। চলন্তিকার সাথে থাকবেন। শুভেচ্ছা রইল।*
*কাউছার আলমঃ শাহরিয়ার সজিব ভাই আপনাকে নতুন দেখছি চলন্তিকাতে। কিন্তু আপনার লিখার হাত ভাল চালিয়ে যান*
*এ হুসাইন মিন্টুঃ ভাই এমন জায়গা খোঁজে পেলে আমাকে একটু জানাবেন, কথা দিচ্ছি আপনাদেরকে বিরক্ত করব না। সবাই শুধু চলে যেতে চায় আসতে ফিরে আসতে চায় না কেউ ।*

রহস্য গল্প

## কঙ্কাল

বিএম বরকতউল্লাহ্ ৷ *লেখালেখি করি সেই ছোটোবেলা থেকেই। বাবার কাছে হাতেখড়ি। বাবা লিখে আমাকে পড়াতেন। আর আমি লিখে বাবাকে দেখাতাম। তালে তালে তালাতালি! জাতীয় দৈনিকে, রেডিওতে আর্টিকেল, ফিচার, রম্য ও ছড়া লিখতাম একসময়। তারপর শিশুতোষ গল্পের প্রতি ঝুকে পড়ি। ছড়া লিখি মাঝে মধ্যে। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থঃ ছয়টি। সবক'টি শিশুতোষ ছোট গল্পের বই। প্রাপ্ত পুরস্কারঃ জাতিসংঘ (ইউনিনসেফ) কর্তৃক আয়োজিত দেশব্যাপী বড়োদের গ্রুপে গল্পলেখা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে "মীনা মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড ২০১১" লাভ করি। পেশাগত কারণে ব্যস্ততার মধ্যেই কাটে সময়। এরই মধ্যে সময় করে লেখালেখি করার চেষ্টা করি। প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়াতে নিয়মিত লিখছি। লেখায় গতানুগতিক চিন্তা-চেতনার পরিবর্তে স্বকীয়তার ছাপ রাখার চেষ্টা করি। ব্লগে লিখে অনেক আনন্দ পাই। প্রিয় পাঠকদের মন্তব্য, পরামর্শ ও উপদেশ আমার লেখালেখির মতো সৃজনশীল কাজে শুধু অণুপ্রেরণাই যোগায় না; নিজেকে পরিশুদ্ধ ও লেখার উৎকর্ষ সাধনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।*

তোলপাড় কান্ড! সমস্ত গ্রাম যেন তেতিয়ে উঠেছে। শান্তিতে নেই, স্বস্তিতে নেই; সবাই আছে দৌড়ের ওপর। একজনের সাথে আরেকজনের দেখা হতেই হন্ত-দন্ত রহস্যের প্রশ্ন - 'ভাই রাত-বিরাতে কী সব ঘটছে শুনেছেন তো? এমন আজব ঘটনা তো বাপ জনমে শুনিনি! এ আবার কীশের আলামত!' এ ভয়ার্ত প্রশ্নটি যাকে করা হলো তিনিও এ রকম প্রশ্ন নিয়েই ছুটছিলেন। গ্রামের ছোট-বড় সবাই এক রহস্যময় ভয়-ব্যাধি ধারণ করে আছে। যতই দিন যাচেছ ততই বাড়ছে রহস্য। এ রহস্যের ঝটও খুলছে না, প্রশ্নের জবাবও মিলছে না।

শীর্ণ নদীর তীরে ছোট একটা গ্রাম-দরগারবন। গভীর রাতে একটি কঙ্কাল এসে ঘোরাফেরা করে এ গ্রামে। লম্বা লম্বা কদম ফেলে বাড়ি-ঘরের সম্মুখ দিয়ে নীরবে হাঁটা চলা করে কঙ্কালটি। চলার পথে একটু পর পর অদৃশ্য হয়ে গিয়ে আবার দৃশ্যমান হয়। হাঁটার সময় কঙ্কালের হাড়গুলো একটার সাথে আরেকটার ঘর্ষণে চূড়ড়াং-চড়ড়ৎ- চ্রং ধরনের শব্দ শোনা যায়। গাঁয়ের ছোট ছোট পাড়ার ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ ধরে এঁকেবেঁকে চলে কংকালটি। এ রহস্যময় ভয়ংকর ঘটনায় গ্রামের ছোট-বড় সবার ঘুম হারাম হওয়ার যো হয়েছে!

সন্ধ্যার আগে যে শিশুটি প্রাণচঞ্চল থাকে, সন্ধ্যার আগমনে সেই শিশুটি নীরব হয়ে যায়। জোরে কথা বলে না, কারণে-অকারণে ভাই-বোনেরা ঝগড়ায় মেতে ওঠে না। কার পাতের ডিমটা ছোট, না মাছটা বড় তা পরখ করে অভিমানে গাল

ফুলিয়ে পাল বানিয়ে রাখে না। যাকে যা দিবে তাই খাবে, যা বলবে তাই শুনবে। একদম চুপচাপ! রাতে যে কংকালটি এসে নীরবে ঘোরা -ফেরা করে সে যদি কারো গলার আওয়াজ শুনে কোনো উছিলায় ঘরে মাথা ঢুকিয়ে শিশুটির কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তখন উপায়!

রক্ত নেই, মাংস নেই, লোম নেই, চামড়া নেই; শুধু শুকনো সাদা হাড়! ধণুকবাঁকা শূণ্য খাঁচার মত বুক! মোটা চিকন ছোট বড় বাঁকা-ত্যাড়া গ্রন্থিত হাড়, কড়ি ভাঙ্গা সরু আঙ্গুল, মাথার ফাটা খুলি, উঁচু কপাল, চোঙ্গার মত চোখের গভীর গর্ত, ল্যাপ্টা-চ্যাপ্টা নাক, খিল আঁটা বত্রিশ দাঁত। উফ্ কী ভয়ানক বিশ্রী ব্যাপার! ভাবতেই ভয়ে বুকটা ধুক ধাক করে; কলজে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। এর সামনে পড়ে মরতে যাবে কোন পাগলে!

দুই. কংকালের ভয়ে সন্ধ্যার পরে সহজে কেউ ঘর থেকে বেরোয় না। একা চলাফেরা করে না। এতদিন যা খুবই স্বাভাবিক ছিল এখন আর তা স্বাভাবিক রইল না। ইঁদুর চিকার দৌড়াদৌড়ি, চামচিকার ফুড়ুৎ-ফাড়ুৎ উড়াউড়ি, শুকনো পাতার মচমচানি, হুতোম পেঁচার ভয়ার্ত ডাক, শিকারী বিড়ালের ইঁদুর ধরার পাঁয়তারা, হালকা হাওয়ায় গাছের পাতা নড়া-চড়ার শব্দ- এসবই মনে হয় কংকালের নীরব আনাগোনা।

কংকাল ভয়ে ঘরে ঘরে নানান সমস্যা ও জটিলতা শুরু হয়ে গেছে। রাতের বেলার বাইরের কাজগুলো সারা হচেছ ঘরে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কেউ দরোজার খিল খুলে আর প্রকৃতির কোলে গিয়ে বসে না; লোটা বদনা আর মাটির পাতিলা নিয়ে বসে পড়ে ঘরের কোণায়। এভাবে আর কত দিন!

গ্রামের ময়মুরুব্বীরা এ সমস্যা সমাধানের লক্ষে নানান চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন। তাঁরা শলা-পরামর্শ করে কঙ্কাল তাড়াবার যতগুলো বুদ্ধি-কৌশল আবিস্কার করে এর অধিকাংশই পালিয়ে যায় কঙ্কালের ভয়ে। যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তা দিয়ে কঙ্কাল তাড়ানোর সাহস করা যায় না-হেঁটে বড়জোর ঘরে ফেরা যায়।

তিন. কঙ্কালের ভয়-উপদ্রব থেকে শিশুদের রা করার জন্যে কেউ কেউ মসজিদের ইমাম হুজুরের শ্মরণাপন্ন হয়েছে। ইমাম হুজুর তাদের কথার তেমন আমল দিলেন না। বল্লেন, এগুলো কিচছু না; মনের ভুল থেকে ভয় জেগেছে। এ কথায় কারো মন ভরল না; ভয়ও গেল না। গ্লাস, লোটা, বদনা, বালতি ও কলসীর স্বচছ পানিতে ফু দিতে হলো ইমাম হুজুরকে। শিশুদের সামনে পড়াপানির গ্লাস ধরতেই ওরা ভয়মিশ্রিত আগ্রহে বড় বড় চোখে গড়ু গড়ু করে পানি খায়। সন্ধ্যার আগে আগে মুরুব্বিরা বিড়বিড় করে ঘরের চারপাশে ও দরোজার চৌকাঠে পড়াপানি ছিটায়। শোবার আগে পড়াপানির ঝটকানিতে চোখ বন্ধ করে ঘুমুতে যায় শিশুরা। এতে কাজের কাজ কিছুই হলো না বরং অস্বাভাবিক পানি খেয়ে ঘুমের ঘোরে শিশুদের পিশাবে কাঁথা ভিজে সয়লাব। ভোর বেলা মায়েরা আঁচলে নাক চেপে কাঁথা নিয়ে পুকুর ঘাটে যায়। তারা কাঁথা ধুয়ে রোদে ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত শরীর ঝাকিয়ে গাঁয়ের কাপুরুষদের ভর্তসনা করতে করতে ঘরে ফিরে।

ঘরে-বাইরের এত যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। এর একটা বিহিত করতেই হবে। এ গ্রামে আর ঢুকতে দেয়া যাবে না কঙ্কালটাকে। গাঁয়ের পুরুষেরা ঘরে ঘরে ুব্দ নারীদের তীব্র গুঁতো খেয়ে সাহসী হয়ে উঠল। তারা শুরু করে দিল কঙ্কাল তাড়াবার নানান উদ্যোগ-আয়োজন।

চার. সব উদ্যোগ ব্যর্থ হলো। এ নিয়ে মুরুব্বীরা গ্রামের মাথা সিরু মন্ডলের কাছে গিয়ে বিস্তর আলোচনা ও শলা-পরামর্শ করলেন। সিরু মন্ডল এত সমস্যা ও বিড়ম্বনার কাহিনী শুনে অনেকটা উত্তেজিত হয়ে বল্লেন-"একটা কঙ্কাল গাঁয়ের মানুষকে নাস্তানাবুদ করবে, সারা রাত ভয় জাগিয়ে শিষ মেরে ঘুরবে, আর তোমরা বসে বসে আঙ্গুল চুষবা, তা তো হতে পারে না! রাখ, সারা রাত পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করছি। কঙ্কালটি দেখামাত্র পিটিয়ে ছাতু বানিয়ে ফেলতে হবে; তারপর কি হয়, সে আমি দেখব।" -এ কথা বলে মন্ডল রাগে কাপতে লাগলেন।

মুরুব্বি গোছের একজন ভয়ে অভিমানে আঙ্গুল খাড়া করে বল্ল, "অবস্থা কিন্তুক বেগতিক। ঘরের ভেতরে খাওয়া-দাওয়া, পিশাব-পায়খানা সমানতালে চলছে। আপন ঘরের মহিলারা পরের মত আচরণ করছে, আর আমাদের কাপুরুষ বলে গাল পাড়ছে। আজ থেকেই পাহারার ব্যবস্থাটা করে ফেলতে হবে, মন্ডল।"

"কে কে পাহারা দিবা, নাম বলো। লাঠি, শরকীর ব্যবস্থা করে দিচিছ।" সিরু মন্ডলের এ আহ্বানে সবার চোখ গোল হয়ে গেল। ভয়ংকর কঙ্কালটাকে পিটিয়ে ছাতু বানাবে কে-এ নিয়ে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ও মৃদু গুঞ্জরণ শুরু হলো। কারো নাম প্রস্তাব পাওয়া গেল না।

খানিক অপোর পর সিরু মন্ডল নড়ে চড়ে বসে তাচিছল্যের হাসি দিয়ে বল্লেন, "তোমরা ঘরে হাগবা, পাতিলায় মুতবা কিন্তুক রাতে ঘর থেকে বেরোবে না। হুহ্, বিলাই দিয়ে বুঝি কুত্তা খেদানো যায়! বোঝা গেছে, এ কাজ তোমাদের দিয়ে হবে না। ডাক দেখি বইদ্দাকে। ওই নচছার বইদ্দাকে ছাড়া এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো বাও নেই।" এ রকম সরস কথায় অনেকটা নির্ভার হয়ে সবাই মাথা ঝাকিয়ে হ হ, হ্যা হ্যা করে উঠল। কয়েকজন সোৎসাহে বইদ্দাকে ধরে নিয়ে আসার জন্যে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

পাঁচ. এখানে বইদ্দা সম্পর্কে দুটো কথা না বল্লে হয় না। বইদ্দা এ গ্রামের বাসিন্দা। বয়স কম-বেশি চল্লিশ। তার কাম-কাজ, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, কথা-বার্তা, জীবন-যাপন স্বাভাবিক নয়, অনিয়ন্ত্রিত, বল্গাহীন। ভয়শূণ্য, বেতাল-বেসামাল। সে কারো ধার ধারে না, জাত-পাত মানে না, কাউকে তোয়াক্কা করে চলে-বলে না। কারো ভয়ে মিথ্যা কথা কয় না। তাকে দিয়ে অনেকেই সামান্য কিছুর বিনিময়ে অসামান্য কাজ আদায় করে নেয়। ভরা ল্যাট্রিনের পায়খানা ফেলতে বইদ্দার ডাক পড়ে। এলাকার ওঝা-কবিরাজেরা মাত্র এক ছিলিম গাজার বিনিময়ে তাকে দিয়ে অসাধ্য সাধন করে। গভীর রাতে দিগম্বর হয়ে একাকী গোরস্থানের মাটি ও শ্মশানঘাটের ছাই এনে দেয় এ বইদ্দা। তার এ রকম বহু উপকারের ও নানা দুঃসাহসিকতার কাহিনী আছে কিন্তু স্বীকৃতি নেই। সমাজের লোকজনেরা সভ্য-ভব্যতার খাতিরে বদিউজ্জামানকে বইদ্দা বলে ডাকে। এ সমাজ-সংসারে বইদ্দা অপাঙক্তেয়।

ছয়. তরিৎকর্মা পুরুষেরা বইদ্দাকে নিয়ে এল মন্ডলের সামনে। আলুথালু, ঢুলাঢুলি ভাব। সে নির্বিকারভাবে বল্ল, বইদ্দার ডাক পড়ল যে মন্ডল, ঘটনা কি?
মন্ডল বল্লেন, "সহজে তো আর কেউ তোকে ডাকে না; একটা দুঃসাধ্যকে সাধ্য করতে হবে। সে কাজের জন্যে তোকে ডাকা। কঙ্কালটাকে হয় শেষ করবি; নয় তো জন্মের মত গ্রাম ছাড়া করবি। কোনটা করবি তুই ক।"
বইদ্দার তাৎণিক জবাব- "অসম্ভব, একাজ আমি করব না, মন্ডল।" মন্ডল অবাক হয়ে বল্লেন, "তোর আবার সম্ভব-অসম্ভব কি রে? এ কাজের বিনিময়ে তুই কি চাস, তাই আগে বল; পারব না বল্লে তো হবে না। জীবন মরণ সমস্যা। টাকা-পয়সা, নেশা-টেশা সব দিব তোকে।" একজন আগ বাড়িয়ে হাত নাচিয়ে বল্ল, "যত চাস তত দেব, নগদ চাস নগদেই দিব। কি কন মিঞারা? "সবাই সমস্বরে জবাব দিল, "তা আর কইতে হয় বুঝি, আগে কঙ্কালটা শেষ করে আমাদের জানটা বাঁচাক না।"
বইদ্দা হুঙ্কার ছেড়ে হাত নেড়ে বল্ল, "টেকা-পয়সার লোভ দেখাবেন না। আজ রাতেই খতম করে দেব কঙ্কালটাকে। বিনিময়ে শুধু একটা জিনিস দিতে হবে আমাকে।"
মন্ডল কৌতূহলের সাথে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার বল তো দেখি বইদ্দা, এর বিনিময়ে কি দিতে হবে তোকে?"
বইদ্দা দৃঢ়তার সাথে বল্লÑ" আমাকে বীরের মর্যাদা দিতে হবে।"
টাকা-পয়সা, নেশা-টেশার পরিবর্তে বইদ্দার মুখে এ রকম অকল্পনীয় দাবির কথা শুনে সবাই হা করে রইল। খানিক নীরবতার পর মন্ডল মাথা তুলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্লেন, "হে ঠিক আছে। তুই আগে কঙ্কালটা খতম কর, তোকে বীরের মর্যাদাই দেয়া হবে।"
বইদ্দা হনহন করে চলে গেল।

সাত. সুবেহ সাদিকের আগে আগে গোরস্থান থেকে অদ্ভুত চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দে গ্রামের ঘুমন্ত মানুষের কান খাড়া হয়ে গেল। হুড়মুড়িয়ে মানুষজন বাইরে এসে বলছে, এই রে-, মনে হয় ধরে ফেলেছে। বইদ্দা-বইদ্দা বলে গোরস্থানের দিকে সভয়ে এগুচেছ কেউ কেউ। হঠাৎ গোরস্থানে একটা আগুনের কুন্ডলী পাক খেয়ে উপরে উঠে দপ্ করে নিভে গেল। বইদ্দার লাঠির তীব্র আঘাতে কঙ্কালটি আগুনের কুন্ডলী পাকিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল কি না! আতঙ্কে থমকে দাঁড়াল সবাই। বইদ্দা গোরস্থান থেকে চিৎকার করে বলছে, খতম, খতম। শেষ করে দিয়েছি, শেষ করে ফেলেছি। ভয় নেই, আর ভয় নেই। সবাই ঘুমাও। তারপর একটা শব্দ এলো। ধপ করে পতনের শব্দ।

চারদিক থেকে লোকজন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলো গোরস্থানে। বইদ্দাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। ক্লান্ত-শ্রান্ত বইদ্দা উপুড় হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। আশপাশের লতাপাতা, গাছগাছালি ও বইদ্দার সারা গায়ে ধস্তাধস্তির অসংখ্য ছাপ। তার মুখ থেকে সাদা ফেনা বেরিয়ে আসছে। থরথর করে কাঁপছে তার সমস্ত শরীর। ভীড় ঠেলে সিরু মন্ডল এলেন। বইদ্দা, বইদ্দা বলে ডাক দিতেই কষ্টে মাথাটা তুলে বইদ্দা বল্ল, "আমি আমার কথা রেখেছি মন্ডল।"

আট. মন্ডলের ইশারায় কয়েকজন তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে গেল প্রাইমারি স্কুলের মাঠে। লাল গাইয়ের টাটকা দুধে গোসল করানো হলো বইদ্দাকে। কৌতূহলী লোকে লোকারণ্য

স্কুল মাঠ। মন্ডল ভীড় ঠেলে বইদ্দাকে নিয়ে একটা টেবিলের উপর গিয়ে দাঁড়ালেন। আবেগে কৃতজ্ঞতায় সিক্ত মন্ডল বইদ্দার কাঁধে ডান হাতটা রেখে আন্তরিকতার সাথে ধীরে-সুস্থে বল্লেন-`এই বইদ্দা আমাদের ভয়মুক্ত করল। চরম অশান্তি থেকে নিষ্কৃতি দিল। অসাধ্যকে সাধন করল। এখন থেকে আমরা ভয় মুক্ত। চিন্তা মুক্ত। আমি সিরু মন্ডল গ্রামের সবার পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি যে, "জীবন বাজী রেখে গ্রামের মানুষকে ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে দুঃসাহসিক অবদান রাখার জন্য জনাব মোঃ বদিউজ্জামান ওরফে বইদ্দাকে দরগারবন গ্রামের বীরপুরুষ খেতাবে ভূষিত করা হলো।" এ ঘোষণা শেষ হতে না হতেই উচ্ছসিত জনতা মুহুর্মুহু করতালিতে বীর বদিউজ্জামানকে ফুলের পাঁপড়ি ছিটিয়ে হৃদয়ে বরণ করে নিল। জনতার মুখ থেকে আওয়াজ উঠল-বীর বদিউজ্জামান – দীর্ঘজীবী হোক।

মন্তব্য থেকে

*আমির হোসেনঃ গল্পটি ভাল হয়েছে।খুব ভাল।*
*এ হুসাইন মিন্টুঃ হরর গল্প মনে হচ্ছে।*
*গৌমুমোকৃঈঃ ভৌতিক ও রহস্যময় গল্প। ভালো লেগেছে।*
*আরিফুর রহমানঃ আমিও মিন্টু ভাইয়ের সাথে একমত।*

কবিতা

## তোমার চলে যাবার পদধ্বনি

সালমান মাহফুজ ৷ *কবিতার জন্য এ জীবন; মানবতার জন্য এ যুদ্ধ ।*

তোমার চলে যাবার পদধ্বনি
আমি আজো শুনতে পাই ।
সেই নিঃশব্দ দুপুর, অশ্রুসিক্ত চোখাচোখি
রক্তে রক্তে তোলে
অবসাদের ঝড়
চেপে ধরে হৃৎপিণ্ড—
মুমূর্ষু মানুষের মতন কাতরাতে থাকি!

আমার দুঃখেরা আজ বড় বেশি পৈশাচিক,
বড় নির্মম তাদের আচরণ—
শব্দহীন মধ্যরাতে
সঙ্গম করে অশ্রুর সাথে!.....
জানিনা তোমার দুঃখেরা কেমন আছে ।

তোমার কাজলমাখা আঁখি, চ্যাপ্টা নাক, গোলাপী জিব—
সবি আমার কাছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে!
আজো অস্পষ্ট হয় নি—
তোমার চলে যাবার পদধ্বনি ।

মন্তব্য থেকে

*আরিফুর রহমানঃ আমার কাছে কবিতাটি খুব ভাল লেগেছে। চালিয়ে যান অবিরত।*
*আমির হোসেনঃ সুন্দর হয়েছে। ভাল থাকুন।*
*এ হুসাইন মিন্টুঃ অনেক ভালো লাগল আপনার কবিতা।*
*কাউছার আলমঃ সুন্দর হয়েছে।*
*রূপাঃ চমৎকার লিখেছেন । ভালো লাগলো ।*
*গৌমুমোকৃঈঃ ভালোবাসার বিরহ খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। খুব ভালো লাগল। শুভকামনা।*
*সাফাত মোসাফিঃ ভাল হয়েছে।*

বিজটেনর আসছে ...

প্রবন্ধ

# ‘বনলতা সেন’কে ঘিরে অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন!!!

এস ইসলাম ๗ *প্রাক্তন মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কবি শফিকুল ইসলাম বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব। । বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের গীতিকার। সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য 'বাংলাদেশ পরিষদ সাহিত্য পুরস্কার' ও 'নজরুল স্বর্ণ পদক' প্রাপ্ত হন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ:- 'তবু ও বৃষ্টি আসুক', শ্রাবণ দিনের কাব্য', মেঘভাঙা রোদ্দুর' ও'দহন কালের কাব্য'।*

কবি জীবনানন্দ দাশ ও তার ‘বনলতা সেন’ কবিতা বাংলা সাহিত্যে একটি বহুল আলোচিত বিষয় । তার কাব্যে কারণে-অকারণে তরু-গুল্ম-লতা-পাতা ঝোপঝাড়ের এত বর্ণনা পাওয়া যায় যে তাকে কবি না বলে একজন অকৃত্রিম বনসংরক্ষক বা ফরেষ্ট গার্ড বলে ভ্রম হতে পারে। বাংলাভাষার কোন কবির সম্ভবত এত গাছপালার নাম-ধাম জানা নেই।

তারই রচিত ‘বনলতা সেন’ বাংলা সাহিত্যে একটি বহুল আলোচিত কবিতা। বহুল আলোচিত বলেই এর ব্যাপক বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। দীর্ঘদিন থেকে কবিতাটি একইভাবে পাঠ করা হচ্ছে। বেশীরভাগ পাঠক কবিতাটি সম্পর্কে পূর্ব-ধারণা নিয়ে কবিতাটি পাঠ করছেন। যার ফলে কবিতাটি তার বহুমাত্রিক ব্যাখা-বিশ্লেষণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।’বনলতা সেন’কে ঘিরে অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন নীচে তুলে ধরলামঃ-

বনলতা সেন কি নারী না পুরুষ কবিতটিতে তা স্পষ্ট নয়।”অন্ধকার বিদিশার নিশার মত চুল” এবং “শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মত মুখ” এবং “পাখীর নীড়ের মত চোখ” নারী/পুরুষ যে কারো থাকতে পারে। বরং দীঘল কেশ,কাজল-টানা চোখ এর কথা উল্লেখ থাকলে বনলতা সেন যে আসলেই একজন নারী তা নিশ্চিত হওয়া যেত।
পুরো কবিতায় বনলতা সেন কর্তৃক কোন রমণীয় পোষাক যেমন, শাড়ীর আচল, স্তন-আবরণী উড়না/উত্তরীয় এসবের বর্ণনা নাই। এছাড়া কোনরকম প্রসাধনী/অলংকার ব্যবহারের বর্ণনা নাই। বাঙালী নারী প্রসাধন-প্রিয়,বিশেষ করে সুন্দরী নারীরা এ ব্যাপারে আরো সচেতন। বনলতা সেন পুরুষ বলেই কি এসব কবির নজরে আসেনি ?
 বনলতা সেনের প্রতি কবির প্রেম কি একতরফা?
বনলতা কি শুধুই সৌন্দর্যময়ী না প্রেমময়ী? বনলতা সেন চরিত্রে প্রেম ও সৌন্দর্যের অসম সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।
 জীবনানন্দের প্রতি বনলতা সেনের প্রকৃতই প্রেম নাকি একজন চরম হতাশাগ্রস্থ পুরুষের প্রতি সহানুভূতি?
 শুধু চুল,মুখ ও চোখের বর্ণনা নারী দেহের সৌন্দর্য বর্ণনার জন্য যথেষ্ট কিনা ? নারী দেহের আকর্ষণীয় প্রত্যঙ্গ যেমন, বিল্ব স্তন, পদ্মযোনী, গুরু নিতম্ব এসব বর্ণনার অনুপস্থিতি কি তার নারী-সৌন্দর্যের ঘাটতির ইঙ্গিত দেয় না?
 কবি বনলতা সেনকে কেন অন্ধকারে আকাঙ্খা করেন? [ ডঃ আকবর আলী, প্রাক্তন উপদেষ্টা,তত্ত্বাবধায়ক সরকার টিভি চ্যানেলে একই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন]

 বনলতা কি বিবাহিতা না কুমারী? কবির সাথে এই সম্পর্ক কি পরকীয়া?
 কবিকে দু’দন্ড শান্তি দিয়েছিলেন বনলতা সেন, এই শান্তি কি শুধুই মানসিক নাকি মনোদৈহিক?
 নাটোরের বনলতা সেন কবিকে দু’দন্ড শান্তি দিয়েছিলেন,তবে কবি আর কোথায় শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়েছেন?
 হাজার বছরের ক্লান্ত কবি মাত্র দুদন্ড শান্তি পাওয়ার কথা অতৃপ্তির সাথে অভিমান-ভরে জানিয়েছেন। কবির এই অপূর্ণ প্রাপ্তির বেদনা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। কবিতাটিতে প্রাপ্তির চেয়ে প্রত্যাশাই প্রধান্য পেয়েছে।
 নাটোরের বনলতা সেন এর সাথে কবির কি নাটোরেই দেখা হয়েছিল নাকি অন্য কোথাও...
 কবি যে সময়ের নাটোরের বনলতা সেন এর কথা বলেছেন সে সময়ে নাটোরে সেন বংশীয়া সম্ভ্রান্ত সুন্দরী রমণী বসবাস করতেন বলে জানা যায় না।

 “বনলতা সেন” কবিতা জুড়ে একজন পর্যটকের বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে নাকি একজন প্রেমিকের উচ্ছাস প্রাধান্য পেয়েছে?
 কবি কি শুধুই ভ্রমণ-ক্লান্ত ছিলেন নাকি দেহে-মনে অতৃপ্ত ছিলেন?
 বনলতার সাথে কবির এই মিলন দুটি অসমবয়সী নর-নারীর মিলন কিনা,কারণ দীর্ঘ পথচলার শেষে কবি বনলতা সেনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। আর সেজন্যই কি অসমবয়সী

কবিকে দু'দন্ড শান্তি দিয়েই বনলতা সেন আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন?
 কবি কি শেষ পর্যন্ত একজন প্রত্যাখাত পুরুষ ? জীবনানন্দ ছিলেন দাশ বংশীয় আর বনলতা ছিলেন সেন বংশীয়া- এ জন্যই কি বননলতা অসবর্ণ সম্পর্কে সম্মত হননি।

 কবিকে বনলতা সেনের তির্যক প্রশ্ন- এতদিন কোথায় ছিলেন'? বনলতা সেন কি কবিকে সন্দেহ করতেন? মনে হয় অন্ধকারে সাক্ষাৎ করতে আসায় বনলতা সেন কবির উপর খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন।
 বনলতা সেন কবিকে খুব বেশী ভালবাসতেন বলে মনে হয় না। কারণ কবি এতদিন কোথায় ছিলেন জানতে চাইলে ও কেমন ছিলেন জানতে চাওয়া হয়নি। কাজেই দীর্ঘ অদর্শনের পর নায়ক-নায়িকার আবেগময় সাক্ষাৎ এখানে অনুপস্থিত।
 বনলতা সেন কি কবিকে অনাগ্রহের সাথে বরণ করেছিলেন ,না হয় মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনার বর্ণনা কবিতাটিতে অনুপস্থিত কেন?

 "অন্ধকার বিদিশার নিশার মত চুল" এবং "শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মত মুখ" সার্বজনীন উপমা কিনা? [সোনালী চুল ইংরেজদের প্রিয় এবং সরল মুখশ্রী অনেকের পছন্দ]
 "অন্ধকার বিদিশার নিশা" দ্বারা নিষ্প্রদীপ বিদিশা নগরীকে বুঝায় না। কাজেই ঘন-কালো চুলের উপমা হিসেবে এটা সঠিক নয়।
 অন্ধকারে বনলতার সাথে সাক্ষাৎ করে বনলতার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ অবলোকন করা সম্ভব কিনা?
 অন্ধকারে কবির উপস্থিতি টের পেয়ে ও বনলতা কেন প্রদীপ জ্বালেননি ? অন্ধকারের সাক্ষাৎ পর্বটি প্রচলিত নৈতিকতা-বিরোধী কিনা?

 "ডানায় রোদের গন্ধ মুছে ফেলে চিল"-'রোদের রঙ' এর জায়গায় 'রোদের গন্ধ' লেখার মত ভুল তথ্য কি একজন কবির কাছ থেকে আদৌ প্রত্যাশিত ? কবি কি বর্ণান্ধ ছিলেন?
 তাছাড়া কবির চিন্তাধারায় যথেষ্ট অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। হাজার বছর পথ হাটার কথা বলে পরক্ষণেই জলপথে সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরের বর্ণনা দিয়েছেন। মনে হয় কবি চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলেছেন।
 মালয় সাগরের আদৌ কোন ভৌগলিক অস্তিত্ব আছে কিনা? এখানে কবির ভৌগলিক জ্ঞানের দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়।

 কবির ভৌগলিক বর্ণনা প্রাচীন এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সীমিত – তাহলে এই বর্ণনা কিভাবে সকল দেশ কালের পুরুষের প্রতিনিধিত্ব করে? এটি এশিয়াবাসী হতাশাগ্রস্থ পুরুষের নারীর কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ।
 বনলতা সেন কবিতায় সাগর,সবুজ ঘাসের দ্বীপ,হালভাঙা নাবিক,নদীর উল্লেখ থেকে সমুদ্রগামী জাহাজে দীর্ঘদিন নারীসঙ্গবর্জিত নাবিকদের কথা মনে আসে। এটি স্থলভাগের পুরুষের স্বগতোক্তি কখনো নয়। সার্বজনীন পুরুষ এখানে অনুপস্থিত।
 কবি মাত্র হাজার বছর পৃথিবীর পথে হেটেছেন- এ দ্বারা কবি হাজার বছরের পুরুষের কথাই বলেছেন,বক্তব্যটি সর্বকালের পুরুষকে ধারণ করেনি।
 কবিতাটিতে আদিম যুগের শিকারী ও শিকারের কথা মনে করিয়ে দেয়। পুরুষ শিকারী তার নারী শিকারকে খুজে বেড়ায়। এখানে ও নারী পুরুষের অসম আচরণ পরিলক্ষিত হয়। অর্থ্যাৎ পুরুষ সকর্মক নারী অকর্মক/নিষ্ক্রিয়।
 'মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন' থেকে বোঝা যায় কবি ও বনলতা সেন সম্ভবত খুব ঘনিষ্ট ছিলেন না, না হলে উভয়ে পাশাপশি না বসে মুখোমুখি বসেছিলেন কেন? অর্থ্যাৎ বনলতা সেন কবির থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন।

 বনলতা সেন চরিত্রটি (সুন্দরী,অহংকারী,পুরুষবিদ্বেষী যিনি পুরুষকে দুদন্ড শান্তি দিয়েই ছুড়ে ফেলে দেন এবং স্থায়ীভাবে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক) যা সুন্দরী নারীদের বহুগামীতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেয়।
 জীবনানন্দ চরিত্রটি (ভীতু,হতাশাগ্রস্থ,অতিমাত্রায় নারীপ্রেমিক যিনি নারীকেই শান্তি-স্বরূপা বলে মনে করেন,ঈশ্বর কিংবা প্রকৃতি তাকে কোন শান্তি দিতে পারে না) যিনি নারীর নিকট কাতর আবেদন-নিবেদনে অভ্যস্ত এবং নারীকে স্থায়ীভাবে অধিকার করতে জানেন না।
 বনলতা সেন কবিতায় ধূসর জগত,অন্ধকার বিদিশার নিশা,থাকে শুধু অন্ধকার- এসব বর্ণনা থেকে বলা যায় এটি একটি বিবর্ণ বর্ণের কবিতা।

 তাই সবশেষে বলা যায় হাজার বছর ধরে অনোন্যপায় পুরুষ যে নারীর আকাংখা করে এসেছে তাকে না পেয়ে কল্পনায় কিছু সুখ খুজে নিয়ে বাচতে চেয়েছে। একজন কবি হযত হাজার বছর নারীর সন্ধান করে ক্লান্ত হয়ে বনলতা সেন এর নিকট আশ্রয় চেয়েছেন কিন্তু একজন প্রকৃত নারীর সন্ধান লাভের জন্য পুরুষ জাতিকে হয়তো অনন্তকাল

অপেক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে বনলতা সেনই সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কাম্য নারী হতে পারে না।।

মন্তব্য থেকে

*আরিফুর রহমান: ঠিক বলেছেন। আমির হোসেন ভাই। আমিও আপনার সাথে একমত। সত্যিই চমৎকার। ধন্যবাদ।*

*কাউছার আলম:*

*আহমেদ ইশতিয়াক: আবারো সেই একপেশে সমালোচনা... লেখক জীবনানন্দের "বনলতা সেন' কবিতার মাঝে ইতিবাচক কিছুই খুঁজে পেলেন না। হয়ত পেয়েছেন কিন্ত উল্লেখ করেননি। তবে সমালোচনা'র ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিকগুলো উল্লেখ করা তো উচিত। পুরো লেখাটিই বিদ্বেষমূলক লাগছে। আমার অন্যতম প্রিয় কবির অন্যতম প্রিয় কবিতাকে তুলোধুনো করা হচ্ছে দেখে আমি ব্যাথিত। যদিও আমার ভালো লাগা অথবা না লাগা সাহিত্যের মানদণ্ড না। কিন্ত জীবনানন্দ দাশ একজন প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য কবি... আর তার বনলতা সেন ও যে পাঠকপ্রিয় কবিতা তা অস্বীকার করি কিভাবে?!! (সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত মতামত)*

*এ হুসাইন মিন্টু: নামটা যেহেতু বনলতা, এর থেকে কি প্রমাণিত হয় না এটা মেয়ের নাম ?*

*গৌমুমোকৃঈ: বনলতা সেন যে একজন বাস্তব চরিত্র-- এটা নাও হতে পারে। এটা কবির একটা কাল্পনিক চরিত্র হতে পারে আর কাল্পনিক চরিত্রে অনেক কিছুই মিল নাও থাকতে পারে। আমার কাছে মনে হয়, কবিতা বোঝা- এই কথাটি অযৌক্তিক। কবিতা আমরা বুঝি না, উপলব্ধি করি। কবিতা তাই যা আমাদের ভাবায়। কবিতার গ্রামার নিয়ে সমালোচনা হতে পারে কিন্তু কবিতার অর্থ নিয়ে সমালোচনা অর্থহীন মনে হতে পারে। একটি কবিতা পড়ে বিভিন্ন পাঠক বিভিন্ন অর্থ বুঝবে এবং অনেক ক্ষেত্রে অর্থ বুঝবেই না শুধু আবছা কিছু উপলব্ধি করবে - এটাই কবিতার স্বার্থকতা।*

ছড়া

## যুবক তুমি

আবু আশফাক

যুবক হলে ওরাও তুমি
তোমার যত ইচ্ছে ঘুড়ি
আকাশ পানে তাকিয়ে হলেও
উদারতা করবে চুরি।

শান্ত হবে শিষ্ট হবে
কোথায়ও আবার জলবে তুমি
কখনও তোমার হুংকারেতে
থেমে থেমে কাপবে ভুমি।

তুমি হবে পথ প্রদর্শক
সকল যুবার আশার আলো
সঠিক পথের নির্দেশনায়
সামনের দিকে এগিয়ে চলো।

মন্তব্য থেকে

*মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক খান: কবিগুরুর একটা কবিতা আছে "সবুজের অভিযান"। যুবকদের নিয়ে লেখা।*

*আজ একটা পড়লাম। ভাল লাগল। চলন্তিকাতে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।*

*আজিম হোসেন আকাশ: খুব ভাল হয়েছে। লিখতে থাকুন....*

বিজটেনর আসছে ...

জীবনের গল্প

# জীবন যুদ্ধ!!

নিজাম মজুমদার নিজু

প্রিয় বন্ধুগন, আজ আমি তোমাদের পানে সমর্পিত। পড়িবার, সমাজ, দেশ এবং ভালোবাসার মানুষের নিকট থেকে যখন তাড়িত হয়েছি। আমি ছোটে গেছি তোমাদের নিকট। তোমরা বন্ধু! আমাকে আশ্রয় দিয়েছ। সাহস ও মনবল যুগিয়েছ। অনেক সময় অর্থ দিয়েও আমার চলার ব্যবস্থা করেছ। ভুলে যাওয়ার মত মনুষত্ব আমার নেই। তবে আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এতটাই নিরুপাই যে! আমি যোগ্যতার বলয় হারিয়ে ফেলি। তখন তোমাদের দৃষ্টি পরে আমার কৃতজ্ঞতার দিকে। তাতে আমি সংকিত নই। আমি লজ্জিত।

শুধু তোমাদের নিকট লজ্জিত নয়! আমি লজ্জিত আমার জন্মদাতা পিতা-মাতার নিকট। আমি পারিনি তাদেরকে ঐর্শ্বয্য দিতে। পিতার যখন শক্তি ও সমর্থ ছিলো, যতটুকু পেড়েছে অন্ন বস্ত্র এবং ঐর্শ্বয্য দেয়ার চেষ্টা করেছে। আজও হাল ছেড়ে দেয়নি। অনেক গুলো দূর্ঘন্টার কারনে শক্তি সামর্থ হারালেও! মনবল হারায়নি। প্রমাণ করতে চায়। ইচ্ছা শক্তি মানুষের জীবনে প্রলয়ন কারী ঘূর্নীঝড়ের চেয়েও শক্তিশালী। বুঝিয়ে দেয়। আমি এখনো কারো বোঝা হয়নি। পড়িবারের হাল ধরে রাখার যোগ্যতা আমার আছে।

সত্যি ইচ্ছা শক্তি মানুষকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে। ২০০৩ সালে ডাক্তারের ভূল চিকিৎসার দরুন এক চোখের আলো নিবে গেলেও পৃথীবিকে অন্ধকার মনে করেনি। তারপর ২০০৭এ মামার পিছনে মোটরসাইকেলে বসে পায়ের হাড় ভেঙ্গেও পঙ্গুত্ব বরণ করেনি। সর্ব শেষ ২০০৮ সালে ব্রেন স্ট্রোক। থেমে যায়নি বাবার জীবন। আজও লড়ছে আমাদের সুখের জন্য।

আজ আমরা প্রতিষ্টীত। দুই ভাই দু'হাতে টাকা রোজগার করি। ঐর্শ্বয্য গড়তে গিয়ে এই মাহে রমজান মাসে পড়িবারের দায়িত্ব গ্রহণে অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছি। বাবার কাঁদে বর করেই অনেক দিন যাবত বেঁচে আছে মা, মেজু বোন এবং তার দুই সন্তান।

আমি জানি! মা মিত্যা বলে। সব সময় বলে! আমি ভালো আছি। তোর বাবা ভালো আছে। ঔষুধ আছে কিনা জানতে চাইলে। এক ব্যাকে বলে দিবে। আছে! সত্যি তাই নয়। জানি তোমাদের ইচ্ছা কি। পিতৃপুরুষের সম্মান এবং মর্যাদা তোমাদের সন্তানদের মাঝে বিরাজমান থাকুক। সেটাই তোমাদের চাওয়া। এইটাই তোমাদের সকল কষ্ট ভোগের প্রাপ্তি।

যদি কেও জানতে চায়! আর কত দূর পাঞ্জেরি? আমি বলবো নাও তরি বিড়তে বেশী সময় নিবে না। ভোগ এবং ঐর্শ্বয্য এক সুতায় গেঁথে দিবো বাবা-মার পদপানে। এই ধারা অক্ষুণ্ন রাখতে কারো তৃষ্কার, দিক্কার, মান, অভিমান, দুঃখ, কষ্ট আমাকে গ্রস করতে পারবে না। সর্বপরি কারো ভালোবাসার মায়া জালে আমি বন্ধী হবো না। ভালোবাসলেও! ভালোবাসা পাওয়ার জন্য পাগলামি করবো না।

লক্ষ্যতো একটাই যা আপনার আছে। তা আমারও আছে। হার-মেনে যাওয়া নয়। জীবনের সাথে লড়াই করা। ভালোবাসার এক সুতুই সকলকে গেঁথে নেয়া। বাবা আমি জানি! আপনি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটেন। অনেকেই করুনার দৃষ্টি দিয়ে আপনার দিকে তাকায়। অনেকেই আবার দেখেও না দেখার ভান করে চলে যায়। মনে মনে ভাবে স্যার চোখে দেখে না। পাশ কেঁটে যাওয়াই ভালো।

এতে আমার মোটেও কষ্ট হয় না। আমি গর্ব করি। বীর যুদ্ধাদের নেয় আপনিও জীবন যুদ্ধে জয়ী। আরো অনেক কিছু ভেবে হাঁসি পায়। যাদেরকে বিনা অর্থে পাঠদান করে ছিলেন। যাদের নিকট থেকে কোনদিন পাওনা আদায় করেননি। তারাই হয়তো আপনাকে দেখলে পাশ কেঁটে যায়। চলার পথে অজান্তে ধাক্কা খেলেও দ্রুত ব্যাগে ছোটে চলে আর ভাবে আমাকে চিনতে পারেনি। আবার অনেকের মুখে আপনার প্রশংসা শুনি। আপনার জন্য তারা আজ দেশ ও দশের একজন। কিন্তু আপনি একজন জনসাধারণ।

অতীতে অনেক রাগ হতো। মনে মনে ভাবতাম কি করেছেন! সমাজ গড়ার দায়িত্ব কাঁদে নিয়ে। জমিদার পড়িবারে জন্ম নিয়েছেন, যে সময় বিএ পাস করেছিলেন। হাতে গুনা কয়েক জনের মধ্যে একজন ছিলেন। চাইলেই বৈধ পথেই কারিকারি টাকা রোজগার করতে পারতেন। সুখ পায়ের নিচে খেলা করতো। তা না করে কারিকারি মানুষ গড়েছেন। যারা আজ কেওই আপনার নয়।

তবে এখন মনে হচ্ছে! আপনি সত্য। জনগণের কাঁদে চড়ে কারিকারি টাকার মধ্যে সুখের সন্ধান না করে। দেশ এবং জনমনে নিজের অর্জিত জ্ঞাণ ও তপস্যা বিলিয়ে দেয়াই প্রকৃত সুখ।

মন্তব্য থেকে

*আরিফুর রহমান: ঠিকই ভাই জীবনে চলতে গেলে যুদ্ধ করে চলতে হয়। জীবন মানেই যুদ্ধ।*

*এ হুসাইন মিন্টু: চলন্তিকায় আপনাকে স্বাগতম ।*

কবিতা

## উদ্যানে নাস্তির ফুল

নোমান রহমান

উদ্যানে নাস্তির ফুল, গৃহে মত্ত ঝড়।

আধুনিক মানুষের খন্ডিত মননে অবিরাম পিছুটানঃ
জন্ম নেয় বিকলাঙ্গ অথবা বিকৃত তন্ত্র।

সাবলীল পদক্ষেপে অভ্রান্ত পথিক শোধ করে প্রজন্মের ঋণ-
দ্বিধাগ্রস্থ আধুনিক মানুষেরা পথে তার ফেলে রাখে কলহের কাঁটা।

গৃহে তার মত্ত ঝড়-
তবু উদ্যানে নাস্তির ফুল ফুটে।

মন্তব্য থেকে

*সম্পাদকঃ চলন্তিকাতে স্বাগত। আমরা নিয়মিত আপনার লেখা চাই।*

*আমির হোসেনঃ চলন্তিকার নতুন ভুবনে আপনাকে স্বাগতম। লিখতে থাকুন অবিরত।*

*রফিক আল জায়েদঃ শুভকামনা রইল।*

*আজিম হোসেন আকাশঃ চলন্তিকাতে স্বাগত।*

কবিতা

## দু:খ দেখেছি

কাউছার আলম ๗ *আমি একজন ছাত্র। কম্পিউটার আমার একটা প্রিয় বিষয়। ব্লগিং করতে আমার ভাল লাগে, ব্লগিং করে অনেক কিছু শেখা যায়।*

রাজপ্রাসাদের বারান্দায়-
নিঝুমঅন্ধকারের গালিচায়-
বঞ্চিত, অসহায় নয়নে
অবিচারের কাঠ খ দেখেছি:আমি দু!গড়ায়-
অলুব্ক অশরীর সকালবিকাল-
বেনিয়াদীর রক্তমাখা শৃঙ্খলে
হিম আঁচল ছেড়ে বহুদূরে
পাইথন ভরা অবিনাশি জলে
বন্দী ঘরের তালায়আমি দুখ দেখেছি:
হাজার দুর্বলের আকিঞ্চনে
শিরোনামহীন মিছিলের পথে পথে

ভাসমান বরফখন্ডের মত
প্রতিনিয়ত দু!খের অভিশ্রবনে:
আমি দুখ দেখেছি:
আকাশের বিশাল বুকে
বৃষ্টির জলকেলিতে-,
থৈ থৈ করে কাঁপা
বিয়োগের শেষে।

মন্তব্য থেকে

আরিফুর রহমানঃ কবিতাটা খুব সুন্দর দাদা। কিন্তু দুঃখ বেশি। এত দুঃখ সইব কেমন করে।

এ হুসাইন মিন্টুঃ কবিতা মন ছোঁয়েছে, অনেক ধন্যবাদ

কবিতা

## শুধু বেঁচে থাকার জন্য নির্মোহ নগর যাপন

চারু মান্নান ৷ *আমি কবিতা, ছড়া, গল্প লিখি*

গ্রীষ্মের প্রখর তাপে চৌচির মাটি,
আচমকা সদ্য বৃষ্টি ভেজা, নাকে ছুঁয়ে যায় না কত দিন?
সোঁদা মাটির সেই গন্ধ! কৃষকের তামাটে গা বেয়ে,
ঝরে পরা ঘামের সাথে বৃষ্টির ছিটে ফোটার অম্ল সুখ।

ঝড়বৃষ্টি রাতজুড়ে,
জমে থাকা কাদা মাটির রাস্তায়, জ্যোৎস্না রাতে চিকচিক
মেঠ পথে ডাল ভাঙ্গা, সবুজ গাছের উচ্ছষ্টিংশই,
গভীর রাত যেন এক সূবর্ণ আলোয় হেসে উঠে।

কত দিন কড়া নারে না রাতের জানলায়?
ভেসে আসে না আমুদে কাঁঠাল চাঁপার গন্ধ, রাতভর ভ্যাপসা গরমে
কংক্রিটের দালান পেষণে, সময় কাটগড়ায় কালের বির্মষ অস্থিত্ব,
শুধু বেঁচে থাকার জন্য নির্মোহ নগর যাপন।

মন্তব্য থেকে

*সম্পাদক: মান্নান ভাই, আপনাকে চলন্তিকাতে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা রাখি নিয়মিত আপনার লেখা পাব। অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।*
*মোসাদ্দেক: অসাধারণ.. খুব ভাললাগল..*
*মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক খান: অনেক ভাল লাগল। আরও লেখা চাই।*
*আহমেদ ইশতিয়াক: ভালো লাগলো... আশা করি নিয়মিত পোস্ট করবেন...*

কবিতা

## তোমাকে ভালোবাসব বলে

কবি বাংলাদেশী ৷ *শুধুই তো নিয়ে যাচ্ছি দেবার কথা তো ভাবতে হবে, ঋণী হয়ে তো আর মরতে চাইব না, তাই ঋণ শোধের এই সামান্য প্রয়াস*

শুধু আর একটি বার
শুধুমাত্র একবার
তোমাকে ভালবাসব বলে
তোমার হাতে হাত রাখব বলে
তোমার চোখে চেয়ে থাকব বলে
তোমার চোখের ভাষা- মনের কথা পড়ব বলে
তোমার মুখে আলতো করে ছুয়েঁ দেখব বলে
তোমার চোখে সুখের জল দেখব বলে
তোমার কপালে-কপোলে ঘাম মুছে দেব বলে
তোমার বুকে মাথা রেখে আমি শান্ত হব বলে
তোমাকে আরেকটিবার জাগাতে চাই
তোমাকে ভালোবাসতে চাই
আমার ভালোবাসার পিপাসা মেটাতে চাই।
শুধুমাত্র আর একবার
মাত্র একবার সুজোগ দাও আমায়
দাও তোমাকে ভালোবাসতে আমায়
জন্ম জন্মান্তর তোমাকেই শুধু ভালোবাসতে চাই
চাই ভালোবেসে যেতে।

তুমি মাটির বিছানা ছেড়ে উঠে এসো
এসো, তুমি উঠে এসো
আমাকে প্রতীক্ষায় রাখবে আর কত্ত মহাকাল
তুমি তো এমনটা ছিলে না কোনোদিন
কেন তবে আজ এমন করছ
তুমি এসো,এসো শুধুমাত্র আমার জন্য
এসো মাটির বিছানা ছেড়ে
না কিচ্ছু হবে না
ভয় ও পাবে না
আমি তো রয়েছি দাঁড়িয়ে কিনারে
আমি ভালোবাসি শুধু-ই তোমারে।
তুমি নাই
আমার পৃথিবীর কোনো খানটাতেই নাই
একথা আমি মেনে নিতে পারি নি কোনদিন
না আমার মানা হবে না
পারব ও না কোনদিন
জীবনের কোন ও একটি সময়।
আমি তো দেখছি তুমি দিব্যি আছো
আট প্রহরের সব সময় তুমি আমার ভেতর জেগে আছো

কেন তবে অভিমানে দুরে সরিয়ে রাখা, দুরে থাকা
কষ্ট দিতে চেয়ে কষ্ট পাওয়া।
তুমি এসো
তুমি এসো
বাঁধার বিন্ধাচল ভেঙ্গেই তুমি এসো
শুধুমাত্র এবারের মতোই আসো একবার
আমাকে তোমার মতো করে ভালোবাসো
আর আমি বাসব ভালো আমার মতো করে।

মন্তব্য থেকে

*মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক খান: কিছু কিছু অনুভুতি থাকে যা প্রকাশ করা কঠিন। আপনি পেরেছেন। অনেক ধন্যবাদ।*
*শাহরিয়ার সজিব: আমার কাছে এমনই মনে হইছে। আপনার সাথে আমি একমত উনি তা পেরেছে*
*আহমেদ ইশতিয়াক: অসাধারণ লাগলো ... শুভকামনা রইল*
*আরিফুর রহমান: খুব ভাল লেগেছে। শুভেচ্ছা রইল। ধন্যবাদ।*
*এ হুসাইন মিন্টু: শুরুর দিকে একই শব্দ বার বার থাকায় একটু অনয রকম লাগলেও শেষেরটুকু বেশি ভালো হয়েছে*

পর্যটন

## হিলারি তেনজিং-এর এভারেস্ট জয়ের ৬০ বছর

সম্পাদক

মাউন্ট এভারেষ্ট হিমালয় পর্বতমালায় অবস্থিত সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে শীর্ষবিন্দুর উচ্চতার হিসেবে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এর উচ্চতা ৮,৮৪৮ মিটার (২৯,০২৯ ফুট)। এটি হিমালয় পর্বতমালার একটি অংশ, এশিয়ার নেপাল এবং চীনের সীমানার মধ্যে এর অবস্থান।

*নেপালের কালা পাথর থেকে এভারেষ্ট*

পৃথিবীর এই উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ সব ধরণের পর্বতারোহীদের আকর্ষণ করে- একেবারেই নতুন পর্বতারোহী থেকে শুরু করে বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পোড়-খাওয়া পর্বত-অভিযাত্রীরাও এতে সফল আরোহণের জন্যে পেশাদার পর্বত পথ-প্রদর্শকদের পেছনে দেদারসে টাকা খরচ করতে দ্বিধাবোধ করে না। পর্বতারোহীরা নেপালের পর্যটন আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস, কারণ এভারেষ্ট পর্বতশৃঙ্গ আরোহণে ইচ্ছুক প্রত্যেক পর্বতারোহীকে নেপাল সরকারের কাছ থেকে ২৫,০০০ মার্কিন ডলার মূল্যের একটি ব্যয়বহুল পারমিট সংগ্রহ করতে হয়। এতে আরোহণ করতে গিয়ে এ পর্যন্ত ২১০ জন পর্বতারোহী প্রাণ হারিয়েছেন, এর মধ্যে ৮ জন ১৯৯৬ সালে পর্বতের অত্যন্ত উঁচুতে ঝড়ের কবলে পড়ে প্রাণ হারান। বিশেষত ডেথ জোন এ আবহাওয়া এতোটাই প্রতিকূল যে বেশিরভাগ সময় হতভাগ্য পর্বতারোহীর মৃতদেহ সেখান থেকে উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় না। এরকম কিছু দৃশ্য আদর্শ পর্বতারোহণ রুট থেকে লক্ষ্য করা যায়।

**সর্বোচ্চ পর্বতচূড়া হিসেবে আবিষ্কার**

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতসমূহের অবস্থান এবং পরিচয় শনাক্ত করার লক্ষ্যে ১৮০৮ সালে পরাধীন ভারতে ব্রিটিশরা বৃহৎ ত্রিকোণমিতিক জরিপ আরম্ভ করে। জরিপকাজে নিঁখুত পরিমাপের জন্যে ১১০০ পাউন্ড অজনের থিয়োডোলাইট ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ ভারত থেকে জরিপকাজ আরম্ভ করে জরুপকারী দল ক্রমাগত উত্তরদিকে সরতে থাকে এবং ১৮৩০ সালে তারা হিমালয়ের পাদদেশে পৌঁছায়। কিন্তু রাজনৈতিক এবং ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের ভয়ে নেপাল সরকার ব্রিটিশদের তাদের দেশে প্রবেশাধিকার দেবার ব্যাপারে অনিচ্ছুক ছিল। জরিপ দলের নেপালে প্রবেশের সকল আবেদনই প্রত্যাখান করা হয়।

সব বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করে ব্রিটিশ জরিপকারী দল কাজ চালিয়ে যায় এবং ১৫০ মাইল (২৫০ কিমি)দূর পর্যন্ত অবস্থিত পর্যবেক্ষণ স্টেশন থেকে হিমালয়ের জরিপ কাজ সম্পন্ন করে। তবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে বছরের কেবল শেষ তিন মাস জরিপকাজ চলত।১৮৪৭ সালের শেষ দিকে ব্রিটিশ প্রধান জরিপকারক এন্ড্রু ওয়াহ হিমালয়ের পূর্ব দিকে অবস্থিত

সবাজপুর স্টেশন থেকে বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করেন। সে সময় বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতচূড়া হিসেবে বিবেচিত হত কাঞ্চনজঙ্ঘা। ওয়াহ কাঞ্চনজঙ্ঘার ১৪০ মাইল (২৩০ কিমি) পূর্বে আরো উঁচু একটি পর্বত লক্ষ্য করেন। প্রায় একই সময়ে জন আর্মস্ট্রঙ নামে তার এক কর্মচারীও একটি ভিন্ন অবস্থান থেকে চূড়াটি লখ্য করেন এবং একে peak-b হিসেবে অভিহিত করেন। ওয়াহ পরবর্তীতে মন্তব্য করেন যে যদিও পর্যবেক্ষণ হতে বোঝা যাচ্ছিলো যে peak-b কাঞ্চনজঙ্ঘা অপেক্ষা উচ্চতর, তা সত্ত্বেও প্রমাণের জন্যে আরো নিকটতর স্থান হতে পর্যোবেক্ষণ প্রয়োজন ছিলো। ওয়াহ কাজটি এগিয়ে নেবার জন্যে তেরাইতে একজন কর্মকর্তাকে প্রেরণ করেন, কিন্তু মেঘের কারণে জরিপকাজ চালানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

১৮৪৯ সালে ওয়াহ সেখানে জেমস নিকলসনকে প্রেরণ করেন। নিকলসন ১১৮ মাইল দূরে অবস্থিত জিরল থেকে দুটি পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর নিকলসন আরো পূর্বে সরে যান এবং পাঁচটি বিভিন্ন স্থান হতে তিরিশেরও অধিক পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করেন, যার মধ্যে নিকটতমটি ছিল এভারেস্টের ১০৮ মাইল (১৭৪ কিমি) দূর হতে নেয়া।

নিকলসন অতঃপর ভারতের গঙ্গা-তীরবর্তী শহর পাটনায় ফিরে যান এবং পর্যবেক্ষণ হতে প্রাপ্ত উপাত্ত সমূহ নিয়ে হিসাব-নিকাশ আরম্ভ করেন। তার খসড়া উপাত্ত হতে তিনি peak-b এর উচ্চতা নির্ণয় করেন ৩০,২০০ ফুট (৯,২০০ মিটার), কিন্তু এটি ছিল আলোর প্রতিসরণ জনিত ত্রুটি অগ্রাহ্য করে নির্ণীত উচ্চতা। তবুও এই খসড়া হিসাব থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, peak-b এর উচ্চতা কাঞ্চনজঙ্ঘা হতে বেশি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে নিকলসন ওই সময়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন এবং তার হিসাব-নিকাশ অসমাপ্ত রেখেই দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। মাইকেল হেনেসি নামক ওয়াহর একজন সহকর্মী সে সময়ে নামবিহীন চূড়াগুলিকে রোমান সংখয়্যায় প্রকাশ করা আরম্ভ করেন এবং সেই রীতি অনুযায়ী peak-b এর নতুন নাম হয় peak-XV (চূড়া-১৫)। ১৮৫২ সালে বাঙ্গালি গণিতবিদ ও জরিপকারক রাধানাথ শিকদার দেরাদুনে অবস্থিত জরিপ সদর-দপ্তরে বসে হিসাব-নিকাশ করে এভারেস্টের সঠিক উচ্চতা আবিষ্কার করেন এবং একে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতচূড়া হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি এনে দেন।তিনি নিকলসনের তথ্যের ভিত্তিতে ত্রিকোণমিতিক পদ্ধতিতে এই হিসাব সম্পন্ন করেন।

**নামকরণ**

উচ্চতা নির্ণয় করার পর পর্বতচূড়াটির সঠিক নামকরণ হয়ে দাঁড়ায় পরবর্তী চ্যালেঞ্জ। জরিপকারী দল চাচ্ছিল পর্বতচূড়াগূলোর স্থানীয়ভাবে প্রচলিত নামগুলো সংরক্ষণ করতে (উদাহরণস্বরূপ কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ধবলগিরি স্থানীয় নাম)। কিন্তু ওয়াহ বললেন তিনি প্রচলিত কোন স্থানীয় নামের সন্ধান পাননি। বিদেশীদের জন্যে তিব্বত ও নেপাল উন্মুক্ত না থাকায় তার স্থানীয় নামের অনুসন্ধান বাধাগ্রস্ত হয়। বেশ কিছু স্থানীয় নাম প্রচলিত থাকলেও এদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল তিব্বতিদের ব্যাবহার করা কয়েকশ' বছরের পুরনো নাম চোমোলুংমা, যা কিনা ১৭৩৩ সালে দ্য'নভিল কর্তৃক প্যারিসে প্রকাশিত একটি ম্যাপে ব্যবহার করা হয়। তবে ওয়াহ যুক্তি উথথাপন করেন যে যেহেতু অনেকগুলো স্থানীয় নাম প্রচলিত তাই এদের থেকে সঠিক নামটি বেছে নেওয়া দুঃসাধ্য। তাই তিনি তার পূর্বসূরি ভারতের প্রাক্তন জরিপ পরিচালক জর্জ এভারেস্টের নামে পর্বতচূড়াটির নামকরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি লেখেন-

"আমার সম্মানিত পূর্বসূরি জরিপ প্রধান কর্ণেল স্যার জর্জ এভারেস্ট আমাকে প্রতিটি ভৌগোলিক উপাদান স্থানীয়ভাবে প্রচলিত নামকরণ করতে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু এই পর্বতটি, যা কিনা খুব সম্ভবতঃ পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত- এর কোন স্থানীয় নাম আমরা খুঁজে পাইনি, আর কোন স্থানীয় নাম থেকে থাকলেও নেপালে প্রবেশের আগে তা আমাদের পক্ষে নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়। এরমধ্যেই চূড়াটির নামকরণ করার সুযোগ এবং পাশাপাশি দায়িত্বও আমার কাঁধে বর্তেছে.....এমন একটি নাম যা কিনা দেশ-বিদেশের ভূগোলবিদরা জানবে এবং পৃথিবীর সভ্য জাতির লোকদের মুখে মুখে ফিরবে।" জর্জ এভারেস্ট ওয়াহের প্রস্তাবকৃত নামটির বিরোধিতা করেন এবং ১৮৫৭ সালে রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটিকে বলেন এই নামটি হিন্দীতে লেখা সম্ভব নয় এবং ভারতের স্থানীয়রা নামটি উচ্চারণ করতে পারবে না। তবে তার এই আপত্তি ধোপে টেকেনি – ১৮৬৫ সালে রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটি আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতচূড়ার নামকরণ করে মাউন্ট এভারেস্ট।

**কোড ম্যাসেজ**

''স্নো কন্ডিশনস ব্যাড স্টপ অ্যাডভান্সড বেস এবানডন্ড মে টোয়েন্টিনাইন স্টপ অ্যাওয়েটিং ইমপ্রুভমেন্ট স্টপ অল ওয়েল'' এই ম্যাসেজের অর্থ হচ্ছে: ''হিলারি এবং তেনজিং ২৯ মে এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়া জয় করেছে।'' ১৯৫৩ সালের পহেলা জুন এই তথ্য লন্ডনে পৌঁছায়। এভারেস্টের সর্বোচ্চ শিখরে মানুষের পদচিহ্নের খবর শুনে উৎসবে মেতে ওঠে সবাই।

**শুরুর দিককার অভিযানসমূহ**

১৮৫৫ সালে আলপাইন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন টমাস ডেন্ট তার বই Above The Snow Line এ মন্তব্য করেন যে এভারেস্ট পর্বতে আরোহণ করা সম্ভব।

জর্জ ম্যালোরি তার ১৯২১ সালের অভিযানের সময় উত্তরদিক থেকে এভারেস্টে আরোহণ করার পথ আবিষ্কার করেন। ঐ অভিযানটি ছিলো মূলতঃ অনুসন্ধানমূলক অভিযান, চূড়ায় ওঠার মত প্রয়োজনীয় উপকরণ অভিযাত্রী দলটির ছিলো না। ম্যালোরির নেতৃত্বে (যিনি এই অভিযানের মাধ্যমে এভারেস্টের পার্শ্বদেশে পা রাখা প্রথম ইউরোপিয়ানে পরিণত হন) দলটি উত্তরের গিরিখাতের ৭,০০৭ মি (২২,৯৮৯ ফুট) আরোহণ করে। সেখান থেকে চূড়ায় ওঠার জন্যে ম্যালোরি একটি সম্ভাব্য রুট পরিকল্পনা করেন, কিন্তু তার সহযাত্রীরা এরকম একটি দুঃসাহসিক অভিযানের জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। তাই সেবার তিনি ফিরে যান।

ব্রিটিশরা ১৯২১ সালের অভিযানে হিমালয়ে প্রত্যাবর্তন করে। এতে জর্জ ফিনচ প্রথমবারের মত অক্সিজেন ব্যবহার করে পর্বতারোহণ করেন। তার আরোহণের গতি ছিলো বিস্ময়কর – ঘন্টায় প্রায় ৯৫০ ফুট (২৯০ মি)। তিনি ৮,৩২০ মিটার (২৭,৩০০ ফুট) ওপরে ওঠেন, যা ছিল সর্বপ্রথম কোনো মানুষের ৮,০০ মিটারের বেশি উচুতে আরোহণ। ম্যালোরি এবং কর্ণেল ফেলিক্স দ্বিতীয়বারের মতো ব্যর্থ অভিযান করেন। ম্যালোরির নেতৃত্বাধীন দলটি উত্তরের গিরিখাত বেয়ে নামতে গিয়ে ভূমিধ্বসের কবলে পড়ে এবং সাতজন কুলি নিহত হয়।

পরবর্তী অভিযান হয় ১৯২৪ এ। ম্যালোরি এবং ব্রুসের প্রাথমিক প্রচেষ্টা স্থগিত করতে হয় যখন খারাপ আবহাওয়ার কারণে ক্যাম্প VI নির্মাণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরবর্তী প্রচেষ্টা চালান নর্টন এবং সমারভিল, তারা অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়াই অভিযানে নামেন এবং চমৎকার আবহাওয়ার সুবিধা পেয়ে নর্থ ফেস থেকে গ্রেট কুলোয়ির পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। নর্টন ৮,৫৫৮ মিটার (২৮,০৭৭ ফুট ) পরিভ্রমণ করেন, যদিও যদিও শেষ এক ঘন্টায় তিনি মাত্র ১০০ ফুটের মতো উঠেছিলেন। ম্যালোরি শেষ চেষ্টা হিসেবে দ্রুত অক্সিজেন সরঞ্জাম যোগাড় করে এভারেস্টে অভিযানের আয়োজন করেন। এবার তিনি সঙ্গী হিসেবে নেন তরুণ এন্ড্রু আর্ভিংকে। ৮ জুন, ১৯২৪ তারিখে জর্জ ম্যালোরি ও এন্ড্রু আর্ভিং উত্তর গিরিখাত দিয়ে এভারেস্ট-চূড়া বিজয়ের মিশন শুরু করেন। এই অভিযান থেকে তাদের আর ফিরে আসা হয়নি। ১৯৯৯ ম্যালোরি ও আর্ভিং রিসার্চ এক্সপেডিশন নর্থ ফেসের নিচে, ক্যাম্প-VI এর পশ্চিমে একটি তুষার গহবর থেকে ম্যালোরির মৃতদেহ উদ্ধার করে। তারা দু'জন এভারেস্ট চূড়ায় ১৯৫৩ সালে হিলারি ও তেনজিং এর স্বীকৃত সর্বপ্রথম বিজয়ের আগে আরোহণ করতে পেরেছিলেন কিনা তা নিয়ে পর্বতারোহী সমাজে বহু বিতর্ক রয়েছে।

১৯৫২ সালে এডোয়ার্ড ভিস-ডুনান্ট এর নেতৃত্বাধীন একটি সুইস অভিযাত্রী দল নেপাল দিয়ে এভারেস্টে আরোহণের চেষ্টা করার অনুমতি লাভ করে। দলটি খুমবু আইসফলের মধ্য দিয়ে একটি রুট প্রতিষ্ঠা করে এবং দক্ষিণ গিরিখাতের ৭,৯৮৬ মিটার (২৬,২০১ ফুট) আরোহণ করে। রেমন্ড ল্যাম্বার্ট এবং শেরপা তেনজিং নোরকে দক্ষিণ-পূর্ব রিজের ৮,৫৯৫ মিটার (২৮,১৯৯ ফুট) ওপরে ওঠেন, যা ছিল উচ্চতা আরোহণে মানুষের নতুন রেকর্ড। তেনজিং এর এই অভিজ্ঞতা ১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের সঙ্গে কাজ করার সময় সহায়ক হয়। তেনজিং জন্মেছিলেন তিব্বতী গ্রাম মায়জ এ এবং বড় হয়েছিলেন নেপালে।

**হিলারি ও তেনজিং এর সর্বপ্রথম এভারেস্ট জয়**

৩২ বছরের চেষ্টার পর ভূপৃষ্ঠের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টের চূড়ায় প্রথমবারের মতো মানুষের পা পড়ল ১৯৫৩ সালের ২৯ মে। নিউজিল্যান্ডের এডমুন্ড হিলারি ও নেপালের তেনজিং নোরগে- দুই মহাদেশের দুই মানুষ একসঙ্গে জয় করলেন এভারেস্টকে। বরফঢাকা ২৯ হাজার ৩৫ ফুট উচ্চতা পেরিয়ে এভারেস্টে পা রাখেন তারা ২৯ মার্চ সকাল সাড়ে ১১টায়। তবে তাদের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয়ের খবর মানুষ জেনেছিল ২ জুন। নেপাল ও তিব্বত জুড়ে বিস্তৃত হিমালয় পর্বতমালার সর্বোচ্চ চূড়াই হলো এভারেস্ট। স্যার জর্জ এভারেস্ট নামে ১৯ শতকের এক বৃটিশ ভূমি জরিপকারীর নামে এই পর্বতচূড়ার নাম।

**বিবিধ রেকর্ড**

১৯৭৫ সালের ১৬ মে প্রথম নারী হিসেবে এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করার কৃতিত্ব লাভ করেন জাপানের জুনকো তাবেই।

প্রথম দুইবার এভারেস্টে উঠতে সক্ষম হন শেরপা নাওয়াং গোম্বু। ১৯২২ সালের ২০ মে তিনি এই রেকর্ড অর্জন করেন। প্রথমে ১৯৬৩ সালে একটি আমেরিকান অভিযানে এবং ১৯৬৫

সালে একটি ইন্ডিয়ান অভিযানের মাধ্যমে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো এভারেস্ট করেন।

প্রথম প্রতিবন্ধী হিসেবে ১৯৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টম হুইটেকার এভারেস্টের চূড়ায় উঠেন। একটি কৃত্রিম পা নিয়েও তিনি এভারেস্ট জয় করে বিশ্ববাসীকে চমকে দেন।

নেপালের আপা শেরপা সবচেয়ে বেশিবার এভারেস্ট জয় করেছেন। ১৯৯০ সালের ১০ মে থেকে ২০১১ সালের ১১ মে পর্যন্ত তিনি মোট ২১ বার তিনি এভারেস্টের চূড়ায় পা রেখেছেন। নন শেরপা হিসেবে এই রেকর্ড আমেরিকান পর্বতারোহী ও অভিযানের গাইড ডেভ হানের দখলে। ১৯৯৪ সালের ১৯ মে থেকে ২০১২ সালের ২৬ মে পর্যন্ত মোট ১৪ বার এভারেস্ট জয় করেছেন তিনি।

**প্রথম জয়, প্রথম মৃত্যু**

২০১০ সালের ২৩ মে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্টের সর্বোচ্চ শেখরে পা রাখেন মুসা ইব্রাহীম (বামে)। সেই জয়ের খবরে আনন্দের বন্যা নামে বাংলাদেশে। আর ২০১৩ সালে এভারেস্ট জয় করে ফেরার পথে মারা যান সজল খালেদ।

**কে আগে চূড়ায় উঠেছিল?**

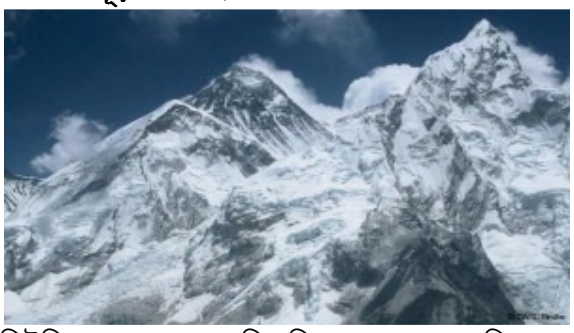

নিউজিল্যান্ডের এডমান্ড হিলারি আর শেরপা তেনজিং নোরগে (ছবিতে বামে) এভারেস্ট জয়ের পর এক নতুন বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এই দু'জনের মধ্যে কে আগে চূড়ায় পা রেখেছিলেন তা নিয়ে শুরু হয় তুমুল রাজনৈতিক বিতর্ক। নেপাল এবং ভারত এই জয় তাদের দাবি করে। তবে এভারেস্ট জয়ের কয়েক বছর পর হিলারি জানান, চূড়ায় ওঠার সময় তিনি তেনজিং এর থেকে কয়েক পা সামনে ছিলেন।

**অক্সিজেন ছাড়াই এভারেস্ট জয়**

হিলারি ও তেনজিং-এর সেই ঐতিহাসিক অভিযানের পরের তিন দশকে বহু পর্বতারোহী বিভিন্ন পথ ধরে এভারেস্টে উঠেছেন। ১৯৭৮ সালে সাউথ টাইরোলিয়ান রাইনহোল্ড মেসনার (ডানে) এবং অস্ট্রেলিয়ান পিটার হেবেলার (বামে) অক্সিজেনের বাড়তি জোগান ছাড়াই এভারেস্ট জয় করেন।

**শেরপারা পথ দেখান**

শেরপাদের সহায়তা ছাড়া কারো পক্ষে এভারেস্টের চূড়া জয় করা কার্যত অসম্ভব। তাঁরা এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার পথের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সদা তৎপর।

**দলে দলে এভারেস্ট জয়**

১৯৯০ দশকের দিকে দল বেধে পর্বতারোহীরা এভারেস্ট জয় শুরু করেন। সেই সময় থেকে প্রতিবছর শত শত পর্বতারোহী এভারেস্টের চূড়ায় উঠছেন। রেকর্ড বলছে, এখন অবধি কমপক্ষে ৬,০০০ বার সফলভাবে এভারেস্টের চূড়া জয় করেছে মানুষ। আবহাওয়া ভালো থাকলে নির্দিষ্ট কিছু সময়ে এভাবেই এভারেস্টের চূড়ার দিকে যাত্রা করেন পর্বতারোহীরা।

**চূড়ায় পর্বতারোহীদের ভিড়**

সফলভাবে এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে চূড়ান্ত পর্যায়ে অ্যাডভান্সড বেস ক্যাম্প থেকে কমপক্ষে চারদিন সময় লাগে আর এই সময়টা আবহাওয়া অবশ্যই ভালো থাকতে হবে। সাধারণত একইসময়ে অনেক অভিযাত্রী চূড়ার দিকে যাত্রা

করেন, কেননা সবাই আবহাওয়ার পূর্বাভাষের উপর নির্ভরশীল৷ ফলে একদিনে অনেক পর্বতারোহীকে চূড়ায় এভাবে ভিড় করতে দেখাটা স্বাভাবিক৷

**৮০ বছরে এভারেস্ট জয়**

এভারেস্ট প্রতি বছরই চলে রেকর্ড গড়ার এবং ভাঙার খেলা৷ এই বসন্তে আশি বছর বয়সি জাপানি বৃদ্ধ ইউচিরো মিউরা এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়ায় পা রেখেছেন৷ এর আগে ২০১০ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে এভারেস্ট জয় করেন জর্ডান রেমেরো৷ দুটোই রেকর্ড৷

**পর্যটক কমাতে অনাগ্রহী নেপাল**

এভারেস্টের চূড়ায় আরোহনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন বিধিনিষেধ আরোপ করার পক্ষে নয় নেপাল৷ বরং প্রয়োজনীয় টাকা থাকলে যেকেউ চেষ্টা করতে পারে এভারেস্ট জয়ের৷

**বাংলাদেশের এভারেস্ট জয়**

২০১০ সালের ২৩ মে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন মুসা ইব্রাহীম৷ এরপর আরো চারজন বাংলাদেশি এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছেন৷ এদের মধ্যে দু'জন মেয়ে৷ আর ২০১৩ সালে চূড়া জয় করে নামার পথে 'ডেথ জোনে' মারা যান সজল খালেদ৷

*তথ্যসূত্র ও ছবি :- ইন্টারনেট, বিভিন্ন দৈনিক ও উইকিপিডিয়া*

মন্তব্য থেকে

*আজিম হোসেন: সফলতা ছুঁয়ে যাক সবার প্রাণে...*
*মোসাদ্দেক: মানবজাতির উন্নয়নের সাক্ষি এই পোষ্ট..অনেক তথ্যপূর্ণ লেখা..*
*আহমেদ ইশতিয়াক: এভারেস্ট সম্পর্কে এত তথ্যসমৃদ্ধ পোস্ট করার জন্যে সম্পাদককে ধন্যবাদ ...*
*আরিফুর রহমান: এভারেস্ট সম্পর্কে ভাল কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পোস্ট করার জন্য সম্পাদককে অসংখ্য ধন্যবাদ।*
*আমির হোসেন: এভারেস্ট এ যাওয়ার স্বপ্ন দেখি। জানি তা পারব কিনা।*

বিজটেনর আসছে ...

কবিতা

## ভালোবাসা

মোঃ আমিনুল ইসলাম ৷ *সুখ নয় দুঃখকে বেশি ভালবাসি। অতি সাধারণ একজন মানুষ, লেখার ইচ্ছা আছে, জানি না কতটুকু লিখতে পারি তবুও হাল ছাড়িনি তাই এখনও লিখছি, যদি কিছু হয়।*

ভালোবাসা কখনো আত্ম সমর্পন করে না
হয়তবা স্থানান্তর হয়,
হৃদয় কখনো দ্বিখন্ডিত হয় না
হয়তবা হৃদয়ের প্রসার হয়।

তেমনি স্থানান্তর কিংবা প্রসারতা
আপনকে পর করে দেয়,
নতুবা পর থেকে আপন,
তেমনি ভালবাসার প্রতিদান হয় না
এ প্রতিদান দিতে গিয়ে খুন হয়েছে অগণিত সুখ, স্বপ্ন এবং সংসার।

তাই তো আর তোমাকে ফেরৎ চাই না
হিসেব চাই না আর,
তুমি এক হাত হয়তো ছেড়ে দিয়েছ
তুমি পারবে, আমি ভুল করবো না
হয়তবা অন্য দু'হাত ধরে নেব।

জীবন ছোট মন ছোট নয়, বাল্য থেকে বুড়ো
আমি ঠকলাম না তুমি ঠকলে
হয়তো দেখবে হারিয়ে,
দেখতে ভালো রাস্তা সরু, বেখেয়ালিতে হারাতে শুরু
দেখতে কালো মনটা ভালো
আসবে তা চিরকাল, এটাই সত্য এটাই রীতি।

মন্তব্য থেকে
*আহমেদ ইশতিয়াক: চলন্তিকায় স্বাগতম জানাচ্ছি। আশা করি নিয়মিত লিখবেন। আর আপনার এই কবিতাটি ভালো লাগলো। শুভেচ্ছা রইল আপনার প্রতি*
*আরিফুর রহমান: চলন্তিকায় স্বাগতম জানাচ্ছি। চলন্তিকাতে নিয়মিত থাকবেন সেই কামনা করি।*

কবিতা

## বর্ষার জলে

মোসাদ্দেক ৷ *বাংলা আমার প্রাণের স্বর বাংলা আমার মা, বাংলা তুমি কণ্ঠ আমার স্বপ্নের পূর্ণতা।*

রাতের আধারে মিলিয়ে যায় সব স্বপ্নগুলো
যত কল্পনা মনের আল্পনা যত আছে সব,
খুজে দেখি আছে নাকি খানিক অংশ-
মুখরীত স্বপ্নে জাগ্রত হবে স্বপ্নদের কলরব।
সব মুছেগেছে বর্ষার জলে ঝরা বৃষ্টির ফোটায়,
শুকনো পাতার মত ঝরেগেছে স্বপ্ন হলুদ পাতার বোটায়।
কাঠালের পাতার মত ঝরেগেছে স্বপ্নগুলো-
তবুও আমি নিশ্চুপ প্রহর গুণি,
আশাহীন পথে খুজে ফিরি আলো;
স্বপ্নের বীজ বুনি।
জাগ্রত হই নব চেতনায় নতুন প্রভাত বেলা,
স্বপ্নহীন পথে ফিরে যায় আশা; শব্দরা করে খেলা।
অবহেলার চোখে কেটে যায় পথ; মুছে যায় ইতিহাস-
ঝরা অশ্রুরা প্রতিবাদ করে, করুণ দীর্ঘ শ্বাস।
তবুও স্বপ্নের আল্পনা আঁকি নতুন কোন রাতে,
মুছে যায় তা অশ্রু বিন্দুর শোকের জাগা স্রোতে-
তবুও থামেনা হৃদয় ক্রন্দন শান্তমনের ঘরে,
আসবে বিজয় প্রতিক্ষার প্রহর নতুন কোন ভোরে।
আশাহীন পথে খুজে ফিরি আশা,
খুজি স্বপ্ন নব রত্ন মনের জাগা ভাষা।

মন্তব্য থেকে
*আমির হোসেন :ভাল লাগল।*
*রফিক আল জায়েদ :ভালই হয়েছে*
*আরিফুর রহমান :ভালই লাগল মোসাদ্দেক ভাই। ধন্যবাদ।*

প্রবন্ধ

# বাকরুদ্ধ

আযাহা সুলতান

সাহিত্যাঙ্গনে আমার পদার্পণ অলৌকিকতাই নয় একেবারে অকল্পনীয় বলা যায়। আমি যেই পরিবেশ থেকে লেখালেখির দুনিয়ায় প্রবেশ করেছি, সেই পরিবেশ থেকে সাহিত্য কি, সাধারণত চিঠিপত্রের ভাষাও আশা করা যায় না। চৌদ্দ পুরুষের বংশনির্ঘণ্ট ঘেঁটে দেখেছি, আমার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কেউ সাহিত্যিক বা পণ্ডিতমনা ছিলেন কিনা। দেখেছি, মোল্লামৌলবি শিক্ষক শিক্ষিত অনেকেই ছিলেন কিন্তু সাহিত্য কি, সাহিত্যমনস্কের ধারেকাছে একজনকেও পাওয়া যায় নি। তবে কোত্থেকে যে আমার উপর এ ভূতের আছর নাজিল হল জানি না। ভাবিত মন সব সময় ভাবনার বেড়াজালে আটকে বলে লেখ, আর আমি হিজিবিজি লেখি–কারককে বলি কখনো অকর্মা আবার অকর্মককে বানাই কখনো কর্মবীর। আমার মাঝে এ এক নিষ্ঠার অভাব। কোন্ পথ ধরে চলি তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। নিজস্ব ধারা কি তাও বুঝি না। তবে জানি, লক্ষ্যহারা হলে সদগতি হয় না। ছোটবেলায় একটা শখ ছিল ছবি আঁকার। ফুল-পাখি মাছ-নদী যা এঁকেছি কাগজ থেকেও নয় একেবারে মানস থেকেও মুছে গেছে আজ। মানুষ যা হতে চায় তা হতে পারে না, যা কল্পনা করে না তা হয়ে যায়। এ এক আল্লাহতালার লীলা! তবে আমি কবি বা লেখক হতে লেখি না। আমি কেন লেখি নিজেও জানি না। শখ বলতে আমি বুঝি আনন্দের বিষয়। কিন্তু যেখানে আনন্দ নেই সেখানে শখের কোনো অর্থ নেই। অনর্থক এ শব্দটার কাঁধে মিথ্যাবোঝা চেপে পার পাওয়া অযৌক্তিক। যাই হোক, দুঃখের মাঝে অনেক লম্বা সফর অতিক্রম করে এসে গেছি এবং দুঃখের মাঝেই অবশিষ্ট রাস্তা শেষ হোক এ কামনা করি। অতএব কোনেকদিন নগণ্য সাহিত্যিক হতে পারি সেই গ্যারান্টি যে নেই একথাও জোর দিয়ে বলতে পারি। কারণ আমার বিলম্ব বেশি সাধনা খুব কম। আমি আজ জীবনমাঠের শেষসীমায়, যেখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে স্পষ্ট দেখা যায় আমার গন্তব্যঠিকানা।

লেখালেখিতে আমি বুঝি না নুন-মরিচ, বুঝি না স্তর-স্তবক, ছন্দ-ঝঙ্কার-অলঙ্কার, মাত্রা-অমাত্রা, মিত্র-অমিত্রাক্ষর। যা মনে আসে, মন বলে বল, তাই আমি বলি–আকাশকে নির্ঝর, বাতাসকে নিরন্তর, মাটিকে ধারক, ঈশ্বরকে কারক। এতটুকু তবে বুঝি, কাকে অনুকরণ করা যায় না। হাঁ, তবে ক্ষেত্রবিশেষে কিছুটা অনুসরণ করা যায়। কারণ অনুকরণ আর অনুসরণের মধ্যে বেশি পার্থক্য না থাকলেও কিছুটা ব্যবধান ত আছেই। অনুসরণ করে কারও রাস্তা ধরে কিছু দূর হাঁটা যায় তবে গন্তব্য পাওয়া যায় না। কিন্তু অনুকরণ করে কিছু দূর ত দূরের কথা, প্রথম কদমেই ফোটা যাবে কাঁটা। এসব আমার ঢের জানা। তার পরেও চলার পথে যেমন অনেকের সাক্ষাৎ মিলে, লেখালেখির জগতেও লিখতে লিখতে কোনেক লিখায় নিজের অজান্তেই কারও ভাবছায়া চলে আসে তবে ওটাকে বর্জন করা উত্তম। কারণ এটা যেমন হৃদয়গ্রাহী হয় না তেমন অবিস্মরণীয়ও কখনো হতে পারে না। তাই লেখালেখিতে নিজস্ব এক ভাবধারা তৈরি করা একান্ত দরকার। নাহয় নিজের প্রতিভাকে ঠকানো হয়। আমরা জেনেশুনে কখনো বিষ পান করে ফেলি...

আমার এক বড় ভাই বলতেন, ভাই-বন্ধু থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত সংসারে এমন কোনো লোক নেই তোকে ভালবাসে না। তা প্রমাণ করতে চাস? তবে এমন সময় এমন এক বিপদ দেখাস, যেই বিপদ থেকে তোর উত্তোলন সহজই নয় একেবারে অসম্ভব বলা যায়। তখন বুঝতে পারবে ভালবাসার রং।

বহু বছর আগে 'খুনি' নামক একটা কবিতা লিখেছিলেম। কবিতাটির পুরো রচনা শেষ হলে 'খুনি' নাম পরিবর্তন করে 'দেশদ্রোহী' নামে নামাঙ্কিত করি। কথা হচ্ছে, কবিতাটিতে নিজের অজান্তেই একটা অপরাধ হয়ে যায়। কবিতাটির শুরু এবং শেষ যেমনই হোক কিন্তু মধ্যিখানে এসেই 'আমি' শব্দটা বারবার উচ্চারণের কারণে কিছুটা নজরুলের বিদ্রোহী কবিতাকে স্মরণ করে দেয়। তবে 'আমি' শব্দটা ছাড়া নজরুলের ব্যবহারিত কোনেকটা শব্দ কবিতাটিতে ব্যবহার করা হয় নি। তার পরেও আমি নিজেও সন্দিহান...এবং বিনষ্টপূর্বে কার কী অনুভূতি জানার মনস্থ করে সম্পূর্ণ অবগত হওয়ার লক্ষ্যে কবিতাটি বেশ কয়েকটি ব্লগে পোস্ট করি। গল্পকবিতাব্লগে ও অন্যান্যব্লগে তেমন কোনো বিরূপ মন্তব্য দেখলাম না। মামুন ম. আজিজ এবং মনির মুকুল ত পঙ্ক্তিগণনা হতে শুরু করে এমনকি শব্দগণনা পর্যন্ত শেষ করেছে গল্পকবিতাব্লগে। যা আমিও কখনো কল্পনা করব

দূরের কথা, এটা আমার মাথায়ও আসার কথা না। কবিতাটিতে এক হাজার কত জানি শব্দ ছিল এবং দুই শ আটত্রিশ কত জানি পঙ্‌ক্তি ছিল। বলতে গেলে এটা ওঁদের মহানুভব এবং মহানতা। মনে করি এটাও একটা ভালবাসার রূপ। মানুষ ত সবাই কিন্তু মহান খুব কমই হয়। একথা শুনে কেউ যদি মনে করে, আমি সাবাসিকে সাদরে বরণ করি এবং আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানাই তা হলে বলব, তাঁরা ভুল। নিন্দুককে আমি ভালবাসি। যে আমার সমালোচনা করে আমি মনে করি তিনি আমার উপকারক, আমি তাঁকে সব সময় বন্ধু ভাবি। আমি মনে করি, আঘাত ছাড়া মানুষ কখনো বড় হতে পারে না। থাক, অর্থহীন কথাবার্তা। এবার কবিতার কথায় আসি, বড় কবিতা লিখা তখন খুব শখ ছিল; ধীরে ধীরে শখের গণ্ডি পার হয়ে একসময় আদতে পরিণত হয়ে গেছিল। যাক, সেসব কথা। এখন বিশেষ কথা হল, সেদিন প্রথম-আলো-ব্লগে প্রায়ই সাত পৃষ্ঠার এ কবিতাটিতে দুয়েকজনের মন্তব্য দেখে আমি হতাশই নয় একেবারে নির্বাক! মানুষ মানুষকে এত অধম ভাবতে পারে তা আমার আগে জানা ছিল না। এক ভদ্রলোক দেখি ইংলিশে অনেক বড় কথা বলে গেল। ভদ্রলোকের নামধাম প্রকাশ করে লজ্জা দিতে চাই না তাঁকে। বরং প্রার্থনা করি তিনি মানুষ হোক। আফসোস, সামান্য একটা লেখার জন্যে এত বড় কথা! জানি না সে কত বড় ইংরেজ মানুষ হবে? তবে ভদ্রলোককে বাংলায়–ধন্যবাদ...

বন্ধু, আমি কারও ঘৃণা পেতে এ পৃথিবীতে আসি নি। আসি নি কাকে ঘৃণা করতে। আমি কারও ভালবাসা পাই বা না পাই, আমার মাঝে যা কিছু আছে উজাড় করে দিয়ে যেতে চাই। আমার সৃষ্টিকারক আমাকে সৃষ্টি করেছে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। সুতরাং আমি যদি কারও ভাল করতে নাও পারি, করব না অনিষ্টের সাধনা। আমার মালিক কত রূপে বিচরণ করে সৃষ্টিতে–এ পৃথিবীতে। হয়তো তাঁরই একরূপ আমার মাঝে–আমার এ মনে। আমার অন্তরে মানবপ্রেমের কী অপূর্ব ঢেউ খেলে–আন্দোলিত হয়, যদি প্রকাশ্যে দেখাতে পারতাম তা হলে বোধহয় তামাম বিশ্বে আমিই হতাম ভালবাসার একমাত্র রাজা। আমি খুব গরিবপরিবারে জন্ম নিয়েছি, গরিবিকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তাই হয়তো আমার ভাষায় কথাবার্তায় চালচলনে কল্পনায় গরিবি গরিবি ভাব। তাই হয়তো বুঝি না আমি ধনীদের হাবভাব। বুঝি না তাদের ভাষাভঙ্গিমা নিয়মনীতি শৌখিনতা। কী করি বন্ধু! নিয়তি আমাকে কুঁড়ের ঘরে দিয়েছে যে ঠাঁই। তাই কথা বলি নিঃস্বের, কথা বলি দরদের। এতে আমার আনন্দ ঢের, আমি নিঃস্বদের একজন...

আমার শিক্ষাযোগ্যতা শূন্য, তাই বলে আমি নগণ্য? আমার মানসী সব সময় একটি কথা কয়, পথের শেষ আছে, পথচলা শেষ নেই। তুমি যেই রাস্তায় চলছ তার শেষে তোমার কোনো গন্তব্য নেই। এখনো পথ অনেক বাকি, শান্ত হয়ে যাও–হয়ে যাও ধীরস্থির। বৃথা অপচয় করো না সুবর্ণসময়–গিরিপর্বত ঠেলতে যেয়ো না মুসাফির। একাজ তোমার জন্যে কঠিন। আমি কোনো মন্তব্য করি না, মনের তৃপ্তি যে তাই...

বন্ধু, তুমি যেমন কারও কাছে ভাল আচরণ আশা কর, তদ্রূপ তুমিও ভাল আচরণ করো। কারও মনের ভেদ না জেনে অন্ধমন্তব্য করা কি আদৌ যৌক্তিক? পৃথিবীতে অনেক রথী-মহারথী এসেছিল, চলে গেল। কেউ স্থান পেল হয়তো কেউ পেল না। তবু যার যতটুকু কর্তব্য সাধন করে গেছে। সব বৃক্ষ যে ফল দিবে এমন কথা নয়, কিছু কিছু বৃক্ষ প্রকৃতির অগাধ সৌন্দর্য বাড়ায়, প্রাণবায়ু প্রবাহিত করে–পরিবেশ বাঁচায়। তাই...

কী হবে এসব ব্লগে লিখে বা না লিখে? কে দেখে এসব ব্লগের লেখাগুলো? বিখ্যাত কোনো সাহিত্যবিশ্লেষক নাকি সমালোচক? একটি ব্লগ একজন লেখককে কখনো মসনদে বসাতে পারে না। তা হলে? যাক, নিয়তির লিখন কখনো মুছে ফেলা যায় না। সবকিছুতে আমি নীরবতাই ভাল মনে করি। আমি দুঃখ পেয়ে নির্জনে কাঁদতে পারি কিন্তু কাকে দুঃখ দিতে পারি না। আমার এত যে শ্রীহীন কাণ্ড, আমি লজ্জায় নিজেকে ফাঁসি দিতে পারি কিন্তু কাকে অশ্রু দেখাতে পারি না। আমি খুব রাগী মানুষও বটে তবে রাগটা যে নীরবে হজম করতে পারি এটাই মনে করি আমার আমিত্ব। আমি আর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব চাই না। কারণ, আমি জানি, রাগের বশে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানহারা হয়। বড় কথা বা গালাগালি খুব তুচ্ছ ব্যাপার কিন্তু রাগের বশে মানুষ অনেক কিছু করতে পারে, এমনকি প্রাণপ্রিয় স্ত্রী-সন্তান-হত্যাও...

ভদ্রজনের মন্তব্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটি সমস্ত ব্লগ থেকে মুছে দিই। এমনকি আমার ফাইল সেভ্ থেকেও। কবিতাটিতে অনেকের সুমন্তব্য থাকলেও কবিতাটি মুছে দেওয়ার পক্ষপাতি আমি। যতই ভাল হোক, আমি মনে করি একটি লেখাই একজন লেখকের জীবনে সবকিছু নয়। যেই সৃষ্টি

স্রষ্টাকে লাঞ্ছিত করে সেই সৃষ্টি বিনষ্ট করা উত্তম। সবকিছুরই একদিন বিনষ্ট আছে। প্রথম-আলো-ব্লগে এ কবিতার প্রথম মন্তব্যকারী আতিকুর রহমান আলমডাঙ্গা ভাইয়ের মন্তব্যে মুগ্ধ হলাম–আন্তরিক ধন্যবাদ। তিনি উপদেশমুলক কথা বলেছেন। উপদেশ আমি আজীবন গ্রহণ করে আসছি। ভাল লাগে এমন উপদেশ শুনতে...

পরিশেষে এসে পড়ে গেলাম দ্বন্দ্বে : মনের প্রশ্ন শুনতে হল ধ্যানে–বলল, কার বিরুদ্ধে তোমার এ লড়াই? কোন্ শান্তিপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ রক্তের লেখালেখি? যারা মর্যাদা বুঝে না তাদেরকে মর্যাদাহানির গল্প শুনানো বোকামি। শুধু ব্লগেইবা কেন, জীবনে আর কোনো লেখালেখি করো না। কী হবে এসব লিখে? বিবেক বলল, একজন সাধক অনেক সাধনাপরে গন্তব্য পায়। শিশুর মুতে আছাড় খেয়ে যদি মনে করে তার সাধনা এখানে শেষ! তা হলে গন্তব্য কোথায়? বড় যে বলে মনে করো সে খুব ছোট। এজন জীবনে ত কোনদিন মানুষ হতে পারবেই না, বরংচে অধঃপতন তার পদেপদে লেগে আছে। আমি বললাম, আজ থেকে আমি বাকরুদ্ধ...

মন্তব্য থেকে

*আজিম হোসেন আকাশ: চলন্তিকাতে স্বাগত। নিয়মিত আপনার লেখা চাই।*
*আরিফুর রহমান: প্রবন্ধটি ভাল লেগেছে। নিয়মিত আপনার লেখা চাই। ধন্যবাদ।*
*কাউছার আলম: আপনার লিখার হাত ভাল চালিয়ে যান।*

কবিতা

## একি শূন্য দিয়ে শূন্যকে ভাগ

শ্যাম পুলক

আমার হৃদপিন্ডে এখন আর রক্ত নেই; শুধুই আগুন।
শিরাতন্ত্র রক্তের পরিবর্তে প্রবাহিত করে রক্ত-পেট্রোল;
তাই ধমনী দ্বারা সারা দেহে ছড়িয়ে পরে অগ্নি জ্বলজ্বল।
পুড়ছে প্রতি অঙ্গ, জিহবায় পাই গলিত মগজের স্বাদ।

আমার হৃদপিন্ডে এখন আর রক্ত নেই; শুধুই আগুন।
শরীর কাটলে রক্ত নেই, চারদিকে ছড়ায় অগ্নি ফুলকি,
পুড়ে, পুড়ায়; প্রেম-নারী-তারার রহস্যে বিধাতার ছল কী?
একি শূন্য দিয়ে শূন্যকে ভাগ; অনন্তের পথের প্রতিবাদ!

আমার হৃদপিন্ডে এখন আর রক্ত নেই; শুধুই আগুন।
জ্বলে পুড়ে হবো একদিন আগুনের রঙে রঙিন ফাগুন।

মন্তব্য থেকে

*গৌমূমোকৃঈ: বাহঃ চমৎকার! গভীর চেতনার কাব্যিক বহিঃপ্রকাশ। চলুক এমন আরও কবিতা।*
*আরিফুর রহমান: কবিতাটি খুব ভাল লাগল। আপনাকে ধন্যবাদ।*
*সাফাত মোসাফি: সুন্দর...*
*এ হুসাইন মিন্টু: চমৎকার*
*রূপা: চমৎকার ভাব প্রকাশ । ভালো লাগা জানিয়ে গেলাম ।*
*আহমেদ ইশতিয়াক: অসাধারণ ! খুব ভালো লেগেছে, কবিকে শুভেচ্ছা..*
*আরিফুর রহমান: কবিকে শুভ কামনা।*

বিজটেনর আসছে ...

শিশুতোষ ও শিক্ষণীয়

# রাজার ভেলা

আলামগীর কবির ₪ *একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করি, প্রতিষ্ঠানের নাম ওয়েভ ফাউন্ডেশন। যখন কলেজে পড়তাম তখন থেকেই লেখালেখির খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু আত্ম বিশ্বাসের অভাবে হয়ে উঠেনি। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের ছোট গল্প এবং হুমায়ুন আহম্মেদ, সুনীল গঙ্গোপধ্যায়, মানিক বন্দোপধ্যায় সহ বেশ কিছু লেখাকের উপন্যাস পড়তে খুব ভাল লাগে। আগে কবিতা পড়তে ভাল লাগত না তবে এখন ভাল লাগে। স্বপ্ন দেখি একদিন এমন বই লিখব যে বইতে সাধারণ মানুষে জীবন চরিত ফুটে উঠবে। অসুস্থ রাজনীতির বিরুদ্ধে আমার স্বল্প মেধা দ্বারা যেটুকু সম্ভব হয় লিখি এবং আগামীতে লিখব, ইনশাল্লাহ। আমি বিশ্বাস করি মানুষ ধর্ম, বর্ণ, জাতি সব কিছুর উদ্রধে। বই পড়া ও লেখা-লেখি করতে আমার খুব ভাল লাগে। আমি যাতে মরণের পূর্ব সময় পর্যন্ত এই দুইটা অভ্যাস চালিয়ে যেতে পারি সকলে সেই দোয়া করবেন।*

এক যে ছিল দেশ। সেই দেশ ছিল প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে ভরপুর। সেই প্রাকৃতিক প্রাচুর্য সম বন্টনের জন্য দরকার ছিল অনেক গাড়ী। অনেক গাড়ী যেহেতু দরকার। সেই গাড়ী চালানোর জন্য প্রয়োজন ছিল অনেক চালক। গাড়ীতো আর যে সে চালাতে পারবে না। তার জন্য দরকার প্রশিক্ষণ। গাড়ী চালকদের জন্য যত মানুষের প্রশিক্ষণ দরকার, তাদের প্রশিক্ষণের জন্য দরকার প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হলেই তো আর চলবে না। তার জন্য দরকার মাস্টার প্রশিক্ষক। মাস্টার প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য যে প্রশিক্ষক হবে সেটা আবার এই দেশে পাওয়া যাবেনা। তাদের প্রশিক্ষণের জন্য পাঠাতে হবে সাত সমুদ্র তের নদীর ঐ পারে। তার জন্য দরকার অনেক টাকা পয়সা। টাকা কোন রকম জুটলেও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য চাই সেই রকম গুণি লোক। যে সে লোককে তো আর প্রশিক্ষণের জন্য সেই দূরদেশে পাঠানো যায় না। যারা দূরদেশে যাবে তাদের আবার ইংরেজী জানা চাই। এই সব নানা বিষয় নিয়ে দেশের রাজা ছিলেন চিন্তিত।

সৃষ্টি হলো আর এক সমস্যার। যাকে তাকে তো আর ইংরেজী শেখানো যায় না। ইংরেজী শেখাতে হলে চাই শিক্ষিত লোক। ইংরেজী শেখার মত শিক্ষিত লোক হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু ইংরেজী শেখাবো কে? কোথায় পাওয়া যাবে সেই রকম ব্যক্তি যিনি ইংরেজী শেখাতে পারবেন। সে হয়তো সারা দেশ খুঁজলে কিছু লোক পাওয়া যাবে। তাদেরকে দিয়ে ইংরেজী শেখানো যাবে। কিন্তু যেন তেনো ইংরেজী শিখলে তো আর হবে না। ভাল করে ইংরেজী শিখতে হবে, সেই দূরদেশের উচ্চারণ শিখতে হবে, বুঝতে হবে তাদের উচ্চারণ। তানা হলে ইংরেজী জানা ভদ্রলোকেরা যতটুকু শেখাবে যারা শিখতে যাবে তারা হয়তো ১০ ভাগের এক ভাগ শিখবে। শেখাতে গিয়ে যাদেরকে প্রশিক্ষণ দেবে তাদের হয়তো ১০ ভাগের আট ভাগ শেখাবে। এই ৮ ভাগ থেকে যে প্রশিক্ষকরা শিখবে তারা হয়তো চালকদের ৬ ভাগ শেখাবে। চালকরা মনে রাখতে পারবে ৫ ভাগ। ৫ ভাগ মেধা দিয়ে যতটুকু গাড়ী চালানো শেখাবে তাতে হয়তো এইটুকু শিখবে যে এ গাড়ী গরুতে টানে না, যন্ত্রে টানে।

যন্ত্রনা তো কম নয়। এই গাড়ী গরুতে টানেনা যন্ত্রে টানে তাতে তো তেমন কোন লাভ হবে না। গাড়ী যন্ত্রে চলে এই টুকু শিখতে লাগবে ৬+৩= নয় মাস। ততদিনে দেশেরর সব্য পণ্য পঁচে শেষ হয়ে যাবে। তাহলে কি করা যায়।

উপরোক্ত ভাবনা সমূহ ভাবতে ভাবতে দেশের রাজা সাহেব ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু বেশিক্ষণ খুম হলো না। রাজা সাহেব তো মহা চিন্তায়। এখন কি করবে? গাড়ী যদি না চলে দেশের এক অঞ্চলের মানুষ ধান পাবে সব্জি বা পোষাক পাবেনা। আর এক অঞ্চলের মানুষ সব্জি পাবে ধান বা পোষাক পাবে না। এক অঞ্চলের মানুষ পোষাক পাবে ধান বা সব্জি পাবে না। শুধু ধান খেয়ে বা শুধু সব্জি খেয়ে বা শুধু পোষাক পরে তো দিন যাবেনা। আগে অন্য দেশের মানুষ এসে বিনিময় করে যেতো এখন তো তারা আর আসেনা। রাজা সাহেব এভাবে বেশ কিছু দিন চিন্তা করলেন। রাত্রে ভাল ঘুমাতে পারেন না। না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখের কোণায় কালি পড়ে গেলো। ও দিকে রাণী সাহেবাও রাজা সাহেবের উদ্বিগ্নতা নিয়ে বেশ চিন্তিত। রাজা সাহেবের এই কষ্ট রাণী ও মেনে নিতে পারছেনা। দেশের জনগণও মেনে নিতে পারছেনা। রাজা সাহেবের এই কষ্ট দেখে রাণী সাহেবা হাওয়া বদলের জন্য নদীর ধারে বাগান বাড়ীতে বেড়াতে নিয়ে গেলো। রাজা সাহেব তো রাণী সাহেবকেও এখন সহ্য করতে পারেনা। দেশের মানুষের কথা ভেবে রাজা সাহেব পেরেষান। দেশের মানুষও তাদের প্রতি রাজা সাহেবের ভালবাসা দেখে তো অবাক। তারা সবাই মসজিদে মসজিদে, মন্দিরে মন্দিরে, গির্জায় গির্জায় প্রত্যেকে নিজস্ব ধর্মালয়ে প্রার্থনা করতে লাগলো। সেই প্রার্থনাতে বোধ হয় আল্লাহ/ভগবান/ঈশ্বর রাজা সাহেবের প্রতি কৃপা করলেন। অবশেষে রাজা সাহেব এক বালকের কাছ থেকে সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলেন।

রাজা সাহেব মহা আনন্দে নাচা-নাচি করছে। তাই দেখে দেশের রাণী ও দেশের সকল মানুষ আনন্দে উদ্বেলিত। রাজা সাহেব বলছেন।
রাজা : রাণী আমি পেয়েছি, পেয়েছি।
রাণী : কি পেয়েছেন?
রাজা :সমাধান পেয়েছি।
রাণী : কিসের সমাধান?
রাজা : এত দিন যে সমাধান আমি খুঁজেছি।।
রাণী : কিভাবে সমাধান পেলেন?
রাজা : বলব, বলব, শুধু তোমাকে একা নয় দেশের সকল মানুষের সামনে বলব। সকলকে একসাথে নিয়ে বলব।
রাজা সাহেবের চাওয়া বলে কথা। সকলেই রাজা সাহেব কি ভাবে সমাধান পেলেন তা জানার জন্য দেশের সব শ্রেণীর মানুষ, সব পেশার মানুষ, সব বয়সের মানুষ আজ সমাগত। আজ রাজা সাহেব তার সেই সমাধান কি ভাবে পাওয়া তার গল্প শোনাবেন। রাজা সাহেব সবার সামনে সমাধান খুঁজে পাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে শুরু করলেন -
রাজা : রাণী তুমি জান আমি পরশু একা একা নদীর ধারে বসে ছিলাম। বসে থাকতে থাকতে দেখি বাজার থেকে কিছু মানুষ বাড়ী ফিরছে নদী পার হয়ে। দু'টো বালক ছেলে তাদেরকে কলা গাছের ভেলায় করে নদী পার করে দিচ্ছে। দু'জন বালক দু'টি ভেলায় পৃথক করে দু'জন করে মানুষ নদী পার করছে। একজন বালক একটি ভেলায় একজন মানুষকে বসিয়ে ভেলা ধরে সাতার কেটে নদীর অপর প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। নিতে নিতে কখনও কখনও ভেলা উল্টে যাচ্ছে, আবার ভেলা যদি উল্টে নাও যায় তবে সেই ভেলায় চড়ে ভেলার যাত্রীর পোশাক পরিচ্ছদ ভিজে যাচ্ছে।
রাণী : উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এতে সমাধান কোথায় পেলে? এটা তো সমস্যা।
রাজা :একটু ধৈর্য্য ধর রানী। সকল সমস্যার মধ্যেই তো সমাধান নিহিত থাকে। তাহলে শোন, এই ভাবে যখন ভেলায় একজন যেতে গিয়ে ভিজে যাচ্ছে, তখন ছেলে দু'টি করল কি! দুইটি কলা গাছের ভেলা একসাথে বেঁধে দিলে এবং তখন দুই জন করে যাত্রী পার হচ্ছে কিন্তু আগের মত ভিজে যাচ্ছে না বা ভেলা উল্টেও যাচ্ছে না। এই সাফল্যে উৎসাহ পেয়ে ছেলে দু'টি আরও কয়েকটি কলা গাছ কেটে এক সাথে বেঁধে নিয়ে বড় আকারের ভেলা তৈরী করল এবং তখন অনেকেই এক সাথে নিরাপদে নদী পার হতে পারছে, কাপড় ও ভিজছে না বা ভেলাও উল্টাচ্ছে না। মানুষের সাথে মালপত্রও নিরাপদে পার করে নিয়ে যাচ্ছে। ঐ ভেলার মত সকলে মিলে আমরা যদি একসাথে চলতে পারি তাহলে আমাদেরও কোন সমস্যা হবে না। আমাদের জীবন চলার ভেলাটাও উল্টে যাবে না।

মন্তব্য থেকে
*আমির হোসেনঃ আপনার ছোটদের নিয়ে লেখা গল্পটিপড়লাম। বেশ ভাল লাগল। আশা করি নিয়মিত লিখবেন।*
*এ হুসাইন মিন্টুঃ আপনাকে চলন্তিকায় স্বাগতম । গল্প ভালো লেগেছে, আশা করি নিয়মিত লেখবেন ।*
*গৌমূমোকৃঈঃ আসলে আমাদের সকলের ঐক্য প্রয়োজন। শুভকামনা রইল।*

কবিতা

## অভিনয়

গৌমূমোকৃঈ ৷ *সাধারণ হতে চেষ্টা করি। ভালবাসিঃ মানুষ। শখঃ ব্লগিং এবং বই পড়া। অবাক করেঃ পৃথিবী। মনের গভীরে জমে থাকা কিছু আজগুবি প্রশ্ন আমাকে স্থির থাকতে দেয় না। তাই সামান্য কিছু লেখালিখির মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে চেষ্টা করি মাত্র। জীবন চালানোর জন্য এপারেল এন্ড ফ্যাশান ট্রেডে কাজ করছি। গৌমূমোকৃঈ আমার পুরো নামের সংক্ষিপ্ত রূপ।*

অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলাম আমি সেই দিনে
জন্মে ছিলাম যেদিন
অনেক চেষ্টা করেছিলাম খাবারের জন্যে
কেউ দেয়নি সেদিন
উপায় না দেখে কান্না শুরু করেছিলাম
অবশেষে আমার মুখে আহার পেয়েছিলাম
তুলে দিয়েছিলেন আমার মা

আজ সত্য কথা বলি
আমার সেই কান্না আসলে ছিলনা প্রকৃত কান্না
ওটা ছিল খাদ্য পাবার জন্য একটা অভিনয়,বাহানা।
সেই থেকে আজ অবধি
অভিনয় করছি নিরবধি
জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনে
জীবনের প্রতিটি আয়োজনে

যেদিকে আমি তাকাই
অভিনয় করছে সবাই
মনে কষ্ট মুখে হাসি
মুখে মুখে ভালবাসি
বুকে ভয় চোখে সাহস
মৃত্যু জয়ের দুঃসাহস।
কলেজে একদিন দেখলাম
হেঁটে যাচ্ছে কাকলী খান
তার সামনে এমন অভিনয় করলাম
যেন তাকেই ভালবেসে নিজেকে উৎসর্গ করতাম
সে আমায় বললো, আমি যদি টিয়ে পাখি হতাম
সারাদিন তোমাকে ট্যাঁ ট্যাঁ করে ভাল বাসতাম।
তারপর একদিন বললো কাকলী,
পড়াশোনার জন্য যেতে হবে দিল্লি
দু'বছর পর দেখা হবে
ইমেইল করো-, স্কাইপিতে দেখা হবে।
দু'বছর পর সে ঠিকই এসেছিল
সাথে এক বছরের সন্তান ছিল
চমৎকার অভিনয় সেও করেছিল।
বিয়ের পর স্ত্রী বললো, আর পারছি না
এবারের সিনেমা শাশুড়ি বনাম মা।
বন্ধুদের মিষ্টি হাসির কথা
চোখের মণিতে অদ্ভুত এক ব্যথা।
ক্রেতাগণ দোকানে হোটেলে কাঁচাবাজারে যায়
বিক্রেতার অভিনয়ে পচা মাছ তাজা হয়ে যায়।
দেশে দেশে রাজনীতির অভিনয় দেখে দেখে
রক্তাক্ত মানুষ রাস্তায় পড়ে থাকে।
ধর্মের অভিনয় দেখে দেখে
ভগবান বোকা বনে থাকে।
পৃথিবী আসলে একটা মঞ্চ অভিনয়ের
দক্ষ অভিনেতা সন্ধান পায় বিজয়ের।

মন্তব্য থেকে
*কবি বাংলাদেশী :বেশ*
*রফিক আল জায়েদ :দুনিয়াটা রঙ্গমঞ্চ আর আমরা সবাই অভিনেতা। ভালই লিখেছেন.....*
*শাহরিয়ার সজিব :ভালো হয়েছে নিয়মিত লিখবেন ।*
*কাউছার আলম :দারুণ লিখেছেন ভাই*

গল্প

## হরিদাসের প্রেম

শাওন রশিদ

বৈশাখের এক বিকাল। প্রচণ্ড গরমে কাহিল জনজীবন। তার উপর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও খানিকটা গরম। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলের হরতাল চলছে। এমনি এক সময়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা মেরে বাড়িতে ফিরছিল হরিদাস। সে এক খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাবসায় শিক্ষা বিষয়ের ছাত্র। বাড়ির কাছে পৌছনোমাত্র তার মুঠোফোন বেজে উঠল। হরিদাস তার মুঠোফোন জিন্স প্যান্টের পকেট থেকে বের করতে করতে বাজনা থেমে গেল। হরিদাস তার ফোনের পর্দায় দেখল তাকে ফোন দিয়েছে নৃপতি। নৃপতি এবং সে একি গোয়ালের গরু। মানে তারা সহপাঠী। হরিদাস কিছুটা উৎসুক হয়ে তাকে কল করল। দুইবার রিং হওয়ার পর ওপাশ থেকে শোনা গেল নৃপতির তীক্ষ্ম কিন্তু নিচু কণ্ঠে এক জ্বালাময়ী খবর, 'হরি, তুই খই? আমগো ভাবি এইনে'।

হরিদাস বলল 'তুই নিশ্চিত?'।

'একশ দশ ভাগ নিশ্চিত। ভাবি আমার সামনে বটতলায় উনার বান্ধবিগো লইয়া গপ করতাছে। তুই কইনে? খিচ্চা দৌড় মাইরা চইলা অ্যায়।' ন্রিপতি বলল।

ওইদিকে হরিদাস নিশ্চিত শোনার পর আর অপেক্ষা করেনি। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিয়েছে ভার্সিটির দিকে। অবশ্য তার কাজ দৌড় মারা পর্যন্তই। কাছে গিয়ে আর ভালবাসি বলার সাহস হয়নি। হরিদাস দৌড়াচ্ছে জান প্রান দিয়ে। রাস্তার আশে পাশের লোকেরাও তার সাথে দৌড় আরম্ভ করল। কেউ কেউ ঢুকে গেল খোলা দোকানগুলোতে। কয়েকটা দোকান তাদের দরজাও বন্ধ করে দিল। হরি দৌড়ায় আর ভাবে বাকি সবাই দৌড়ায় কেন? আর বাকি সবাই দৌড়ায় আর ভাবে কখন পিছন থেকে পিকেটার এসে মাইর আরম্ভ করে। এক বাঁটু ভদ্রলোক হরির পাশে এসে পড়ল দৌড়াতে দৌড়াতে। জিজ্ঞাসা করল 'ভাই, কেথায় দাব্রানি দিছে, আম্লিগ, বিনপি না পুলিচ?'

হরিদাস অবাক হয়ে বলে 'কেউ দাবড়ানি দেয়নাই তো!'

'তাইলে দৌড়ান কেলা?' ভদ্রলোক দ্বিগুন অবাক হয়ে প্রশ্ন করে। তবে সেও দৌড়াচ্ছে। উত্তরের আশায়ই হয়ত!

'আমার জান বইসা আছে। অরে দেখতে' হরিদাসের জবাব শুনে ভদ্রলোক দাড়িয়ে পড়ে।

হরিদাসের পিছনে তাকানোর অবকাশ নাই। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়ে পৌঁছে গেল ক্যাম্পাসে। নৃপতি গেটে দাড়িয়ে ছিল। নৃপতিকে দেখমাত্র হরিদাস তার বালিকার অবস্থান জিজ্ঞাসা করল। নৃপতি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বালিকা কে।

হরিদাস ভাব নিয়ে হেতে চলে গেল সেই মেয়ের সামনে। থুড়ি, একেবারে সামনে না সামনের দেওয়ালের পিছনে। ছোট দেয়াল, নিজেকে আড়াল করার জন্য যথেষ্ট। হরিদাস তাকাল তার স্বপ্নবালিকার দিকে.....

নৃপতি দেখছিল হরিদাস কি করে। সে দেখল হরি দেয়ালের উপর পড়ে গেল আর সেই বালিকা গুলো ছুটে গেল তাকে সাহাজ্য করতে। নৃপতিও সময় নষ্ট না করে দ্রুত চলে গেল বন্ধুর কাছে। কাছে গিয়ে বুঝল তার পড়ে যাওয়ার কারন। এতদুর থেকে দৌড়ে যাকে দেখার জন্য হরিদাস এসেছিল এই বালিকা সেই বালিকা নয়। তাই দ্বিগুন হিটে হিটস্ট্রোক করে হরিদাস ভুপাতিত!!!

মন্তব্য থেকে

এ হুসাইন মিন্টু: গল্প ভালো হয়েছে । আপনাকে অভিনন্দন ও স্বাগতম ।

এ টি এম মোস্তফা কামাল: গল্পটি পড়ে মজা পেলাম। এ রকম আরো গল্প চাই।

কবিতা

## মরণের ঘাটি!

শাহ্ আলম বাদশা ✍ *কবি, ছড়াকার, গীতিকার বিশেষত; শিশুসাহিত্যিক। এ পর্যন্ত ৫টি প্রবন্ধ সংকলন, ১টি গল্প সংকলন, ১টি কিশোর উপন্যাস "ফুলের চোখে পানি', শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থ-- দুরছাই ধুত্তোরী ছাই, ইষ্টিপাখি মিষ্টিপাখি, ষড়ঋতুর দেশে, লিন্তামণির চিন্তা, কিশোর কবিতার বই—ফুলবনে হই-চই, ফুল-পাখি নদী, শিশুতোষ গল্পগ্রন্থ—কালো মুরগি, বেওয়ারিশ লাশ এবং ৪টি অডিও ক্যাসেট (ভোরের পাখিরা/১৯৮৯, শিহরণ-১৩২ এবং ''প্যারোডি'') প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্রজীবন অর্থাৎ ১৯৭৭ সাল থেকেই বাংলাদেশ ও ভারতের পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি। ১৯৭৮ সালে তৎকালীন রেডিও বাংলাদেশ রংপুর কর্তৃক ''উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ ছড়াকার'' হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। ১৯৮৬ সালে সিলেট ছড়া পরিষদ কর্তৃক ছড়ায় অবদান রাখার জন্য পুরস্কৃত। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় বিভিন্ন দৈনিকে সাংবাদিকতাছাড়াও বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকা যেমন; লালমনিরহাট থেকে ত্রৈমাসিক চলমান, ত্রৈমাসিক ব্যতিক্রম, ত্রৈমাসিক দারুচিনি, ত্রৈমাসিক কিশোরকণ্ঠ, ত্রৈমাসিক প্রজাপতিসহ (অধুনালুপ্ত) বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক এবং লালমনিরহাটের প্রথম প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক জানাজানি'র প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্য সম্পাদক। বিসিএস তথ্য ক্যাডারের সদস্য; প্রধান তথ্য কমিশনারের (প্রতিমন্ত্রী) পিআরও হিসেবে তথ্য কমিশনে কর্মরত।*

শকুনের দাপটে আজ কেঁপে যায় মাটি
রোরূদ্যমান পৃথিবী যন্ত্রণাকাতর
জগতটা যেনো তাই মরণের ঘাটি!
শকুনের দাপটে আজ কেঁপে যায় মাটি।।

নির্বাসনে চলে গেছে মানবতাবোধ
চারদিকে ভাঙচূর নেই প্রতিরোধ;
চৌদিকে যমদূত করে হাঁটাহাঁটি
জগতটা যেনো তাই মরণের ঘাটি।।

অশান্ত শকুন ওড়ে মাথার ওপর
হিংস্র নখরে কাঁপে কোমল অন্তর!
সাজানো সংসারও আর নেই পরিপাটি?
শকুনের দাপটে আজ কেঁপে যায় মাটি।।

বিবেক কি মরে গেছে, কঙ্কালসার–
মানবতা কেঁদে যাবে কতকাল আর!!

মন্তব্য থেকে
*ফিদাতো মিশকাঃ সুন্দর লিখেছেন । তবে চৌদিকে শব্দের ব্যাবহার টা নতুন লাগল । শুভকামনা রইল*
*শ্যাম পুলকঃ একটা মজার কথা মনে পড়ল, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এখানে সেখানে অনেক শকুন দেখতাম কিন্তু এখন আর দেখিনা। মনে হয় মানুষের হিংস্রতা দেখে ওরা এখন আসতে ভয় পায়।*
*আপনার কবিতা ভাল লাগল। ধন্যবাদ অনেক।*
*আরিফুর রহমানঃ কবিতাটি বেশ লেগেছে।*
*কাউছার আলমঃ ভাল লাগল আপনার কবিতাটি। চালিয়ে যান।*

কবিতা

## বাবা

আরিফুর রহমান ๗ *লেখালেখি আমার পেশা নয়। আমি শখের কারনে লিখি।*

বাবা আমার সুখে দুখে
কত আদর করে,
তাহার কথা মনে হলে
অশ্রু ঝরে পড়ে।

অসীম আলোর পথ দেখাতেন
বাবা আদর করে,
তখন কি যে খুশি হতাম
প্রাণটি যেত ভরে।

ছোট বেলা বাবা তোমায়
কত যে ভয় পেতাম,
সকাল সাঁঝে তোমার কথায়
পড়তে বসে যেতাম।

মাঝে মাঝে তোমার প্রতি
কত যে রাগ হতাম,
তোমার কথায় রাত দুপুরে
পড়তে যখন হতো।

বাবা তুমি দোয়া কর
তোমার ছেলের জন্য,
তোমার মানিক হয় যেন
এ জগত জুড়ে ধন্য।

মন্তব্য থেকে
*সাফাত মোসাফি: ভাই অসাধারণ লাগল।*
*মোঃ ওবায়দুল ইসলাম: ভালো লাগল।*
*এ হুসাইন মিন্টু: বাবাকে নিয়ে অনক সুন্দর কবিতা ।*
*শাহরিয়ার সজিব: বাবা নিয়ে কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। আপনাকে ধন্যবাদ।*
*সম্পাদক: ছোট ছোট বাক্য দিয়ে অসাধারন কবিতা।*

কবিতা

## মা যে আমার

আরিফুর রহমান ๗ *লেখালেখি আমার পেশা নয়। আমি শখের কারনে লিখি।*

মা যে আমার পরম পাওয়া
এ জগতের আলো,
মা যে আমার ফুলের হাসি
সবচেয়ে ভালো।

মা যে আমার নির্মল সুনীল
আকাশের শুভ্র তারা,
মা যে আমার শান্ত সবুজ
শীতল ঝর্ণা ধারা।

মা যে আমার প্রদীপ শিখা
ধরনীর বুক চিরে।
মা যে আমার অরূপ রতন
আশা অপ্রতিম,
মা যে আমার জয় তিলক
শুভ্র অনুপম।

মা যে আমার জুঁই চামেলী
আমার প্রিয় স্বর্ণা চাঁপা,
মা যে আমার জয় নিশান
চলার পথের দিশা।

মা যে আমার শান্তি সুধা
স্নিগ্ধ চাঁদের আলো,
মা যে আমার এক অনন্যা
স্মরনে দূর হবে সব কালো।

মা যে আমার তপন জ্যোতি
স্রষ্টার অসীম দান,
মা যে আমার স্বপন
আমার মাথার তাজ।

বলছি শোন, আঘাত দিও না মাকে
মায়ের জীবন কর পূর্ণ,
মনে রেখ, মায়ের দোয়ায়

জীবন হবে ধন্য।

তাই আমার পরম চাওয়া
আমার মায়ের সুখ।
তন্ময় হয়ে চেয়ে দেখি
আমার মায়ের সেই স্নেহশীল মুখ।

মন্তব্য থেকে

*আসমা নজরুল: মায়ের প্রতি দুর্বলতা আমার বেশী। ভাল লাগল।*
*এ হুসাইন মিন্টু: মাকে নিয়ে অমায়িক কবিতা ।*
*মোঃ ওবায়দুল ইসলাম: অমায়িক কবিতা।*
*আহমেদ ইশতিয়াক: সুন্দর কবিতা ... ভালো লাগলো ... :)*
*কাউছার আলম: মাকে নিয়ে কবিতা আপনার হাতে আরো চাই।*
*সাফাত মোসাফি: দারুণ কবিতা মাকে নিয়ে। খুব ভাল লাগল।*

রসরচনা

## আমে'র যা দাম!

বদরুল হোসেন

একটি অনলাইনে দৈনিকের শিরোনাম 'আম আছে মাছি নেই' দেখে পুরনো একটি ঘটনা মনে পড়ল। সেটি বলার আগে এ প্রসঙ্গে দুটি কথা বলে নিই।

ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি আমাদের মৌসুমী ফলের মধ্যে জনপ্রিয়তায় আমের অবস্থান শীর্ষে। বইয়ে পড়েছি, 'আম পাকে বৈশাখে কূল পাকে ফাগুনে, কাঁচা ইট পাকা হয় পোড়ালে তা আগুনে।' বাজারে পাকা আম,কাঠাল,লিচু পাওয়া যায় বলে জৈষ্ঠ্য মাস মধু মাস হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। আম পাকতে শুরু করে গ্রীষ্মের শুরুর দিকে, বিশেষ উপায়ে তা বাজারে বর্ষা শেষেও বিক্রির জন্য রাখা হয়।যদিও এখন ক্ষেত্রবিশেষে সারা বছরই বাজারে আম কিনতে পাওয়া যায়, তবু স্বাদ, মান কিংবা দামের কারণে সেটি সবার আয়ত্বের মধ্যে পড়ে না।

একটা সময় ছিল যখন দুধ ছিল অত্যন্ত সহজলভ্য। অন্তত আমাদের ছোটবেলায় তো ছিলই। তো মৌসুমী আম দুধ-ভাতের সাথেও অত্যন্ত পরিচিত একটি পদ। তারপরও সেটা অবশ্য আম-ভাত হিসাবে পরিচিতি পায়নি! দুধভাতই রয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে দুধ ঢেকে রাখলে তাতে মাছি সমাগম হয় না। কিন্তু আম ঘরের মধ্যে রাখলেই, তা যেখানেই রাখুন, মাছি আসবেই। দুধের মাছি নামে একটি বাগধারা প্রচলিত আছে, যা দিয়ে সুসময়ের বন্ধু বোঝানো হয়। কিন্তু আমের মাছি নামে কোন বাগধারা নেই। কি অদ্ভুত বৈষম্য!

ফল হিসাবে আমার প্রথম পছন্দ আম। দেশে থাকতে তো ছিলই, বিদেশে আমার গত অর্ধযুগের অবস্থানকালীন সময়েও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। আমের মৌসুমে প্রতি সপ্তাহেই আম কিনি। কিন্তু কাজের ব্যস্ততায় সেটা খাবার সময় পাই না। অনেক সময় অফিসে নিয়ে যাই।

দুপুরের খাবারের পর ডাইনিংয়ে টিভির সামনে বসে আম খাই। পাকা আম। টিস্যু পেপার দিয়ে জড়িয়ে মুখ দিয়েই খোসা ছাড়িয়ে খাই। আমার সহকর্মীরা আড় চোখে তাকায়। দুই একজন বাকা কমেন্ট করে ।স্বাদ কেমন, কোথাকার আম এই সব প্রশ্নও করে। আমি উত্তর দিই। কিছু মনে করি না।

সেদিন এক ইংলিশ সহকর্মী থাকতে না পেরে আমাকে একটি অনুরোধ করে বসল। তার ব্রাজিলিয়ান বউ আম খুবই পছন্দ করে। সেখানকার আমগুলো নাকি খুবই মিষ্টি (যখন সে বেড়াতে গিয়েছিল তখনকার অভিজ্ঞতায়)।

গত সপ্তাহে সে এক বক্স আম কিনেছে। কিন্তু সেগুলোতে কোন টেষ্টই নাই। তাই আমি যদি সামান্য কিছু আম তাদের জন্য নিয়ে আসি, তার বউ খুবই খুশি হবে। এই বলে আমার পকেটে জোর করে সে কিছু টাকাও ঢুকিয়ে দিল।

আমি বললাম তোমার বউ দেখতে খুবই সুইট, কোন সন্দেহ নেই। তাই বলে তোমার শ্বশুরের দেশের আম ও যে খুবই মিষ্টি, সে তথ্য কোথায় পেলে? তুমি কী জানো, ব্রাজিলিয়ান আমগুলো এই দেশে খুবই সস্তা। কোন স্বাদ নেই বলে কেউ কেনে না।

সে বলল, না না, সেখানকার আম খুবই মিষ্টি। আমি নিজেই গাছ থেকে পেড়ে খেয়ে দেখেছি। এই বিতর্কে যোগ দিল অন্যরাও। সবার কৌতুহল আম নিয়ে আমাদের এই বিতর্কে। আমি বললাম, তুমি আমের জানো কী হে? তোমাদের দেশে

কিছু আলু, গম, চেরী আর বেরী ছাড়া কী আছে। তুমি আমের কী বুঝ?

আফ্রিকান কিংবা ব্রাজিলিয়ান আম আমাদের যেসব আম আছে তার সামনে দাঁড়াতেই পারবে না। আমার আফ্রিকান আর ক্যারিবিয়ান সহকর্মীরা মিটিমিটি হাসল। কেউ কোন প্রতিবাদ করল না। সবাই জানে প্রতিবাদ করে লাভ নেই। আর ভারতীয় কলিগরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল।

যাই হোক, পরের সপ্তাহে আমি তাদের কে এক বক্স আম কিনে দিয়েছিলাম। সেটা খেয়ে আমার ইংলিশ সহকর্মী বলল, তার বউ আমাকে একটি ফ্লাইং কিসসহ বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছে। আর সেও স্বীকার করে নিয়েছে আমাদের আমগুলোই সেরা।

বাংলাদেশে কত দুই দশক ধরে মধ্যস্বত্বভোগীদের আধিপত্যে এক সময়ের সহজলভ্য আম মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। গাছে মুকুল আসতে না আসতেই রাজশাহীর আমের গাছগুলো বিক্রি হয়ে যায়। অল্প দামে কেনা সেই আমগুলিই এমনকি ভরা মৌসুমেও চড়া দামে বিক্রি হয়। যেন সে গুলি শোকেসে সাজিয়ে রাখার আইটেম। ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না।

এবার গল্পটির কথা বলি। আওয়ামীলীগের ৯৬-২০০১ সালের টার্মে ঢাকা শহরের সব জায়গায় অপেন এয়ার কনসার্ট নামক এক সংস্কৃতি চালু হয়েছিল। একদিন ধানমন্ডির সুলতানা কামাল মহিলা কমপ্লেক্সে গেছি এরকম একটা কনসার্টে।সেখানে কয়েকজন তরুন কিছু মেয়েকে উত্যক্ত করছিল। একথা সেকথা বলে তাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছিল। কিন্তু কিছুতেই সেই মেয়েগুলির দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারছিল না। অগত্যা হতাশ হয়ে গলা চড়িয়ে একজন বলছিল, আ'মে (য়েয়ে)র যা দাম, (....) হাত দেওন যায় না!

ছেলটি হয়তো অন্য কিছু বুঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে আমাদের দেশে আমের দাম যে পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে, তাতে কয়জন সেটা কিনে খেতে পারে সেটাই একটা প্রশ্ন। এক সময় প্রকৃতির নির্ভেজাল এই সুস্বাদু ফলটি পশু-পাখি কিংবা কীটপতঙ্গের খাদ্যের তালিকায় থাকলেও, ফরমালিন মেশানোর কারনে আজকাল তারাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বাকি রইলাম শুধুই আমরা। অনলাইন দৈনিকটি কিন্তু বলেনি আম আছে ক্রেতা নেই, বলেছে আম আছে মাছি নেই। কারন আজকাল মাছিও যেটা খায় না, আমরা সেটাই খাই!

মন্তব্য থেকে

*আমির হোসেন: আপনার লেখার মান ভাল। লিখে যান।*
*আজিম হোসেন আকাশ: আমতো দাম হবেই।*
*কাউছার আলম: সবকিছুরই দাম বেশি সেখানে আমের কি দোষ।*
*আরিফুর রহমান: আপনার লেখাটা খুব ভাল লাগল। চালিয়ে যান অবিরত . . . . .*

গল্প

## মৃদু দীর্ঘশ্বাস

জুবায়ের হুসাইন ✍ *লেখালেখি শুরু সেই ছোটবেলা থেকে। ১৯৯৪ সালে একটি জাতীয় সাপ্তাহিকে প্রথম লেখা ছাপা হয়। লেখাটি ছিল একটি ছোটগল্প। মূলত গল্প ও উপন্যাস লিখতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করি। তবে ছড়া, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতিও লিখে থাকি। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় নিয়মিতই আমার লেখা ছাপা হয়। আমি মূলত শিশু-কিশোরদের জন্য লিখতে বেশি স্বাচ্ছন্ন বোধ করি। বড়দের জন্যও কম লিখি না। মৌলিক বিষয়ের উপর লিখতে ভালো লাগে। গতানুগতিক কিছুই ভালো লাগে না। চেষ্টা করি ব্যতিক্রম কিছু সৃষ্টি করতে।*

আকাশটা আজ সকাল থেকেই মুখ গোমড়া করে আছে। বেলা অনেক হয়েছে, একটিবারের জন্যেও সূর্যটা তার মুখ বের করেনি মেঘের আড়াল থেকে। যেন আজ তার বিশ্রামের দিন। অবিরাম পৃথিবীর প্রান্তরে আলো ও তাপ বিলাতে বিলাতে আজ সে কান্ত-শ্রান্ত। কিন্তু সে কি জানে না তার মুখ দর্শন ছাড়া পৃথিবী আলোকিত হয় না, পৃথিবীর কোলে অন্ধকার নেমে আসে? থমকে যায় জীবনের গতিশীলতা?

হাসমত উল্লাহ এনকক্ষণ ধরেই এখানে বসে আছেন। জবুথবু হয়ে নিজের মধ্যে কেমন গুটিয়ে আছেন তিনি। বয়স কত হবে তার? এই তো চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে। অথচ এই বয়সেই কেমন বুড়িয়ে গেছেন তিনি। শরীরটা শুকিয়ে তিন ভাগের এক ভাগ কমে গেছে। মাথায় এক দঙ্গল চুল। কয়েকদিন ধরে চুলগুলো যেন পুরোটাই সাদা রং ধারণ করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। দেখতে হয়েছে অনেকটা ঘরের কোনায় চড়–ই পাখির

বাসার মতো। কান-মুখ বেয়ে পড়ছে মাথার এলোমেলো চুলগুলো।

হাসমত উল্লাহর কপালে এখন চারটা ভাঁজ স্পষ্ট পড়া যায়। মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার কপালে সাধারণত তিনটা ভাঁজ পড়ে। কিন্তু হাসমত উল্লাহর কপালের চামড়ায় কেন চারটা ভাঁজ তা কারোর জানা নেই। হাসমত উল্লাহ নিজেই কি কখনও ভেবেছেন এ নিয়ে? বোধহয় না। ভাববার সময় কোথায় তার?

এই লোকটার গায়ের সাদা শার্টটা ততোধিক ময়লা। ময়লার আস্তরণ পড়ে পড়ে প্রকৃত সাদা রং হারিয়ে কেমন একটা কমপ্লেক্স কালারে রূপ নিয়েছে। কাপড় প্রস্তুতকারীরা এই রংটাকে তাদের কাপড় তৈরির নতুন কালার হিসেবে নিতে পারেন। তাহলে আনকমন একটা কালারের পোশাক তৈরি করতে পারবে ফ্যাশানেবল মানুষ। হাসমত উল্লাহর শরীরে চামড়ার মতো লেগে আছে যে আনকমন কালারের শার্টটাÑ সেটাতে ভিন্ন রঙের কাপড়ের তালিও পড়েছে কয়েকটা। কোনো কোনো তালি'র পাশ ঘেষেই আবার ছিড়তে শুরু করেছে কাপড়। যোগ হয়েছে আরও কয়েকটা নতুন ফুটো। পরনের লুঙ্গিটা হাঁটু ছুঁই ছুঁই। কোমরের দিকটার অনেকখানিই কয়েকবার করে ছিড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। পরের বার ছিড়তে হলে কাপড় হাঁটুর উপরে উঠে যাবে। ফরজ রক্ষা করা তখন সম্ভব হবে না হাসমত উল্লাহর।

হাসমত উল্লাহর হাঁটুর নিচ থেকে পায়ের বাকি অংশটুকু চামড়া ফাটা খসখসে। অবশ্য তার সমস্ত শরীরেই এরূপ অবস্থা যদিও এই অংশটার মতো এতটা দগদগে নয়। পায়ের দশটা নখের কোনোটাই অক্ষত নেই। আঙুলের ন্যায় সেগুলোও ফেটে-কেটে গেছে। কোনো কোনোটার গোড়ায় রক্ত জমে কালচে হয়ে গেছে। মাথাটা নুয়ে আছে তার দুই পায়ের মাঝখানটিতে। কিছুক্ষণ পর পর মুখ তুলে তাকাচ্ছেন। করুণ আর্তি ঝরে পড়ছে তখন তার চোখে-মুখে। পরক্ষণই আবার কোনো অবলম্বনহীন বস্তুর ন্যায় ঝুলে পড়ছে নিচের দিকে। ঘাড়ের পেছনের চামড়া আর ওখানকার অস্থিগুলো বাধা দেয়ায় মাটিতে লুটিয়ে না পড়ে মাঝপথেই ঝুলে থাকছে।

ফুটপাতের এ অংশটাতে ভোর না হতেই কামলারা জড়ো হয়। ঝুড়ি, কোদাল এবং অন্যান্য যন্ত্রাদি সামনে রেখে কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে। মহাজনরা তাদের সাথে কথাবার্তা বলে মজুরি ঠিক করে সঙ্গে নিয়ে যায়। মহাজনের বাসায় বা অন্যত্র গিয়ে কাঙ্ক্ষিত কাজটি করে তারা। সন্ধ্যা হলে মজুরি নিয়ে ঘরে ফেরে বাজার-সদয় করে।

এই মুহূর্তে জায়গাটা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে। হাসমত উল্লাহসহ চার-পাঁচজন বাকি আছে আর। একটা প্রাইভেট কার এসে থামল রাস্তার ধারে। কিশোর বয়সের এক কামলার সাথে কিছু কথা বলল। তারপর ছেলেটিকেগাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। ঘাড় তুলে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন হাসমত উল্লাহ।

ভোর থেকেই ফুটপাতের চায়ের দোকানগুলো খুলে গেছে। কোনো কোনোটা অনেক রাত অবধি খোলা থাকায় দোকানদার সবে উঠতে শুরু করেছে। কাপ-পিরিচের টুং টাং আর মানুষের হাক-ডাক, কথাবার্তায় মুখরিত চারপাশটা।

হাসমত উল্লাহর ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। তার বাম পাশ ঘেষেই একটা চায়ের দোকান। মুখ তুলে দোকানদারকে বললেন, 'ইট্টু পানি খাওয়াবা ভাই?'

'দিচ্ছি।' বলল দোকানদার। কিন্তু তার এই 'দিচ্ছি'টা আর 'দেয়া'য় রূপ নিল না। খদ্দের সামলানোয় ব্যস্ত হয়ে গেল সে।

হাসমত উল্লাহও আর পানি চাইলেন না।

বেলা অনেক হয়েছে। কিন্তু আকাশে মেঘ থাকায় কত বেলা হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না।

হাসমত উল্লাহর সামনে দিয়ে লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। অফিস-আদালত অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে গমন যাদের উদ্দেশ্য, তাদের পরিমাণ এই মুহূর্তে হাতে গোনা। এখন বেশিরভাগই পথচারী।

হাসমত উল্লাহ সঙ্গে একটা ঝুড়ি এনেছেন। তার নিজের শরীরের মতোই ঝুড়িটাও ভাঙাচোরা।

প্রচণ্ড কান্তি এসে তার শরীরটাকে জড়িয়ে ধরছে। ক্ষিধের জ্বালা এখন আর তিনি ততটা উপলব্ধি করেন না। ওটা সয়ে গেছে। বরং পেটে কিছু পড়ার পরেই গা'টা কেমন গুলিয়ে ওঠে। কিছু পর অবশ্য তৃপ্তি ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত দেহে। কিছুক্ষণ আগে পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলেও এখন আর তেমন বোধ হচ্ছে না। কেবল গলার কাছটা শুকিয়ে আছে। যেন কেউ শিরিশ কাগজ ঘষে দিয়েছে ওখানটায়।

হাসমত উল্লাহর দেহের ভার এখন পুরোটায় ঝুড়ির ওপর। চোখ দু'টো তার খোলা। পলক পড়ছে না। কিন্তু সেখানে অস্পষ্টতা। অন্য যারা এসেছিল কাজের জন্য, অধিকাংশই কাজ পেয়ে চলে গেছে। আর যাদের ভাগ্যে কাজ জোটেনি, তারা কেউ ঘরে ফিরে গেছে, কেউবা গেছে অন্য কাজের সন্ধানে। জীবিকার যে বড় দায় তাদের!

কেবল হাসমত উল্লাহই রয়ে গেছেন। আসলে এখান থেকে উঠে যাওয়ার শক্তিটুকুও তিনি পাচ্ছেন না।

হাসমত উল্লাহ আরামবাগের এক বস্তিতে থাকেন। ঘরে তার অসুস্থ স্ত্রী আর দুই ছেলেমেয়ে। স্ত্রী নূরজাহান কঠিন অসুখে ভুগছেন। সারাক্ষণ কেবল কাশেন। এখন তো কফের বদলে কাশির সাথে থোকা থোকা রক্ত বের হয়।

হাসমত উল্লাহর ছেলে ও মেয়ে টোকাইগিরি করে। অবশ্য তারা দু'জনেই স্কুলে যেত। কিন্তু একটা ঘটনা ওদের জীবন থেকে স্কুল নামক জিনিসটি কেড়ে নিয়েছে। তছনছ হয়ে গেছে ওদের সংসারটা।

ভালোই দিন কাটছিল হাসমত উল্লাহর। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে একপ্রকার সুখীই ছিল তার পরিবার। তিনি রিকসা চালাতেন। স্ত্রী নূরজাহান বেগম দু'টো মেসে রান্না-বাড়ার কাজ করতেন। তাদের আশা ছিল- ছেলেমেয়ে দু'টোকে শিক্ষিত করে তুলবেন। ছেলেমেয়ের কামাই খাবেন, এ আশা তারা করতেন না। তবে তারা যেন নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সে প্রত্যাশা মনের মধ্যে বপন করেছিলেন। আর প্রতিনিয়ত তার ডালপালা বিস্তার করে চলছিলেন। কিন্তু কেথেকে এক দমকা হাওয়া এসে বুকের মধ্যে বেড়ে ওঠা সেই আশার বৃক্ষটাকে সমূলে উৎপাটিত করে দিল। পথের দেখা না পেতেই পথের উপর থমকে দাঁড়ালো স্বপ্নেরা।

বস্তিটা দেখাশোনা করতেন রফিকুল ইসলাম নামের এক মানুষ। বড় ভালো মানুষ ছিলেন তিনি। যেমন ধার্মিক, তেমনি দরদী ছিলেন। মনটা তার খুবই উদার ছিল। বস্তির সবার সুখ-দুঃখে সাথী হতেন। কিন্তু গেল নির্বাচনের সময়ই সব কিছু কেমন হয়ে গেল। ভোটের সাতদিন আগে খুন হলেন রফিকুল ইসলাম। স্তর নিয়ন্ত্রণ নিলেন নান্টু শেখ। লোকটা গুণ্ডা টাইপের। একগাদা সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ঘোরেন। রফিকুল ইসরামের সাথে অনেকবারই ঝামেলায় জড়াতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু প্রতিবারই রফিকুল ইসলাম সেটা কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। আসলে নান্টু শেখের রোলুপ দৃষ্টিটা বরাবরই এই বস্তিটার উপর ছিল। তিনিই বস্তিটা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইতেন। বস্তিবাসীরা মনে করে, রফিকুল ইসলাম খুনের পেছনে নান্টু শেখের হাত আছে।

বস্তিবাসীরা"ফিকুল ইসলামের মৃত্যুটাকে একপ্রকার ভুলেই গেল যখন শুনল একটি দল এই বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে তারা ক্ষমতায় গেলে চালে কেজি দশ টাকা করে দেবে। আরও অনেক প্রতিশ্রুতির কথা তারা শুনেছে। কিন্তু সেসব কেউ মনে রাখেনি। মনে রাকার প্রয়োজনীয় দেখা দেয়নি। আসলে দু'বেলা পেট পুরে দু'মুটো ভাত খেতে পেলেই যে তারা সুখী। পরম সুখী। এর বাইরে কোথায় কী হলো না হলো- তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

অধিকাংশ মানুষই দলটির এই কথাটাকে বিশ্বাস করেনি। কারণ এই দলটি যে বরাবরই জনগণের সাথে প্রতারণা করে! কিন্তু বস্তির সবাই ওই দলকে ভোট দিয়েছে তা না, আসলে দু'একজন ছাড়া বস্তির আর কাউকেই ভোটকেন্দ্রে যেয়ে ভোট দিতে হয়নি। নান্টু শেখই তাদেরকে ভোটকেন্দ্রে যেতে নিষেধ করেছে। কিন্তুহাসমত উল্লাহ নান্টু শেখের বারণ শোনেননি। তিনি গিয়েছিলেন ভোট দিতে।

যাই হোক, ভোটের দিন সন্ধ্যার পর থেকেই চারপাশটা বদলে যেতে শুরু করে। নান্টু শেখ পরদিন সকালে এসেই নিয়ে গেলেন হাসমত উল্লাহর রিকসাটা। বাধা দিয়ে কোনো লাভ হলো না। নান্টু শেখের পা জড়িয়ে ধরে অনুনয় বিনয় করলেন নূরজাহান বেগম। তখন নান্টু শেখ সজোরে নূরজাহান বেগমের বুকে লাথি চালালেন। মূলত সেখান থেকেই শয্যাশায়ী তিনি।

হাসমত উল্লাহ অনেকের কাছেই ছুটে গেছেন তার রিকসাটা উদ্ধারের জন্য। ওটাই যে তার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন! কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। কেউ ওর পাশে এসে দাঁড়ায়নি। আসলে পাশে এসে দাঁড়ানোর মতো অবস্থা তখন কারোরই নেই। সবাই আতঙ্কিত কখন তার উপরও নেমে আসে কোনো বিপদ। হারাতে হয় সবকিছু। বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে বসতে হয় পথে।

বস্তিবাসীদেরকে এমন নিরূপায় এর আগে দেখা যায়নি। দু'টো জিনিস এখন তাদের মধ্যে কাজ করছে- এক. ভীতি, আর দুই. দলটি তো দশ টাকা কেজি চাল খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যাক, অন্তত বউ-ছেলেমেয়ের মুখে ভাত তো তুলে দিতে পারবে! আর তাছাড়া বস্তিবাসীরা চায় না কোনো ঝামেলা-ফ্যাসাদে জড়াতে। অবশ্য ঘর থেকে উচ্ছেদ করা হতে হাসমত উল্লাহকে বাঁচিয়েছে বস্তির লোকেরা। কিন্তু প্রতিশ্রুত দশ টাকা কেজির চাল তারা পায়নি। বরং হু হু করে চালসহ অন্যান্য নিত্রপণ্যের দাম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে এখন সেসব। তারা বুঝতে পারছে দলটি তাদের সাথে চরম মিথ্যাচার করেছে।

ওই ঘটনার পর এক প্রকার নিরাশই হয়ে যান হাসমত উল্লাহ। তার সকল স্বপ্ন-আশা যে ধূলিসাৎ গয়ে গেছে!

এরপর তিনিও অসুখে পড়েন। কেবলই শ্বাসকষ্ট হয় তার। অনেকভাবে চেষ্টা করেছেন অনেক কিছু করার। কিন্তু কোনো কাজেই তিনি মন বসাতে পারেননি আর।

স্ত্রীর জন্য ওষুধ কিনতে পারেন না, ছেলেমেয়ের মুখে অন্ন তুলে দিতে ব্যর্থ হন হাসমত উল্লাহ। স্কুল ছাড়তে হয় বাচ্চাদের। বাপ-মায়ের অসহায়ত্ব প্রথম প্রথম না বুঝলেও একসময় বুঝতে শুরু করে। ফলে টোকাইয়ের কাজ বেছে নেয় তারা। মাকে ঠিক মতো ওষুধ কিনে দিতে না পারলেও সকাল-সন্ধ্যে একটা করে পাউরুটি খেতে দিতে পারে ওরা। এরা ভাই-বোন বেজায় খুশি। দারুণ সুখী ওরা।

মা কিছুই করতে পারেন না। কেবল ফ্যালফ্যাল চোখে ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কপালে-গালে চুমু খান আর আড়ালে নীরবে চোখের অশ্রু বিসর্জন দেন।

এই তো সেদিন এসে নান্টু শেখ শাসিয়ে গেছে, 'সাত দিনির মধ্যি তিন বছরের ঘর ভাড়া শোধ করবা। তা যদি না পারো, আমার ঘর ছাইড়া দিবা। বুঝবার পারছ? আমি হলাম গে এক কথার মানুষ।'

হাসমত উল্লাহর মাথায় নতুন করে বাজ পড়ে। এদিকে শরীরে প্রচণ্ড জ্বর বয়ে যাচ্ছে তার। সাত দিনের তিন দিন চলে গেছে।

আর চারদিনের মধ্যে টাকা ম্যানেজ করতে হবে তাকে। তা না হলে... আর ভাবতে পারেন না।

আজ সকালে জ্বর নিয়েই কাজের খোঁজে বেরিয়ে আসেন তিনি। কিন্তু কেউ তাকে কাজে নিল না। কয়েকজন তার দিকে ফিরে তাকালেও কেউ আগ্রহ দেখাল না। আসলে এই শরীরে তিনি যে কোনো কাজ করতে পারবেন না, তা তারা ভালো করেই বুঝতে পেরেছে।

হাসমত উল্লাহ তার ভাঙা ঝুড়িটার উপর একইভাবে কাঁত হয়ে পড়ে আছেন। চোখজোড়া এখনও খোলা। দেখছেন ব্যস্ত শহরের চলাচল। একসময় তিনিও ছিলেন এই ব্যস্ততার একজন। তার পায়ের ধূলিও মিশে আছে এই শহরের রাস্তাগুলোর পিচের সাথে। তার গায়ের ঘাম ঝরেছে এখানেই। দুপুরের তপ্ত রোদে ফুটপাতের কোনো চায়ের দোকানে বা কোনো চালার নিচে আশ্রয় নিয়েছেন। বৃষ্টির সময় রিকসার হুড তুলে রাস্তার কিনার ঘেষে রিকসা দাঁড় করিয়ে রেখে তাতেই আশ্রয় নিয়েছেন। দুপুরের খাওয়া সেরেছেন কত জায়গায়! সব কিছুই এই মুহূর্তে তার চোখের সামনে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। স্মৃতিরা আজ বড্ড জ্বালাতন করছে তাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। কিন্তু কেমন যেন মৃদু দীর্ঘশ্বাস হলো সেটা।

হাসমত উল্লাহর চোখের দৃষ্টিতে অস্পষ্টটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমে। মাথার উপরে কারেন্টের তারে কয়েকটা কাক কা-কা করছে। বিরক্তিকর! কিন্তু নিত্য হরেক রকম শব্দের মাঝে বাস করতে করতে ওসবে আর বিরক্তি আসে না এই শহরের মানুষের মনে।

হাসমত উল্লাহর বাম গালের উপর এক ফোঁটা পানি পড়ল। ছিটকে তা থেকে বিন্দুপানি বাম কানে প্রবেশ করল। ঠোঁটের উপর পড়াতে তৃষ্ণাটা চনমন করে উঠল। চোখের পাতা বার দুয়েক নাড়লেন তিনি। এরপর বড় বড় ফোঁটায় পানি পড়তে লাগল। চায়ের দোকানি চিল্লিয়ে বলল, 'চাচা মিয়া, এইবার ঘরে যান গা। বিষ্টি আসতেছে। ঝড়ও আইবো বোধহয়।'

তাড়াতাড়ি নিজের টং দোকানটা গুছিয়ে সবুজ পলিথিন দিয়ে মুড়ে ফেলল দোকানি। তারপর যাওয়ার আগে বলে গেল, 'অখনও যান নাই? জলদি করে ঘরে যান গা।'

হাসমত উল্লাহ একটুও নড়লেন না। কিছু বললেনও না।

কোত্থেকে একটা মাছি এসে মুখের কাছটায় ভন ভন করে গেল।

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। মুষলধারায় বৃষ্টি।

হাসমত উল্লাহ তেমনিই পড়ে আছেন। সামনে দিয়ে ছুটন্ত পায়ের আবছায়া দেখলেন। ছিটকে তার গায়ে পানি লাগল। তারপর চোখের সামনেটা এক ঝটকায় অন্ধকার হয়ে গেল। আগ মুহূর্তে শরীরটা একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিল। তার আগে চোখেমুখে একটা বেদনার ছাপ দেখা গেল। সেই সাথে মৃদু একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো বুকের গভীর থেকে। তারও আগে দূর থেকে একটা ছেলেকে ছুটে আসতে দেখলেন। বৃষ্টির পানি আশাপাশে ছিটিয়ে শাঁ করে বীরদর্পে চলে গেল একটা পিকআপ গাড়ি। গাড়িটা চলে যেতেই রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখলেন ছেলেটাকে। বৃষ্টির পানিতে দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে লোহিত তরল যোজক কলাগুলো।

মন্তব্য থেকে

*আমির হোসেন - জুবায়ের ভাই চমৎকার গল্প। লিখতে থাকুন অবিরত।*

*আরিফুর রহমান- গল্পটি ভাল লাগল। ধন্যবাদ।*

কবিতা

## শীতলবালির মাঝে ধুধু নিঃঅন্তর

আলমগির সরকার লিটন ৷৷চোখের ভীতর জল জলের ভীতর ছল- তার সাথে না চল, বুঝবি যখন হবে খল

পদ্মার 'টি' বাঁধ নয়-নয় কোরতায়ার
নারুলী ব্রিজ-ঐ যমুনার ঝিকমিক বালুচর
কত দেখেছি- খেলেছি বুক বরাবর-
শীতলবালির মাঝে যেন ধুধু (অন্তরহীন)নিঃঅন্তর-
এক দীর্ঘনিঃশ্বাস- মাঝে মধ্যে বয়ে যেত
শনশান আওয়াজে ভাঙ্গন তুলে কি ভয়-
কৃষ্ণচূড়া ফুটা সকালে- পূর্বালী নীল স্রোত।
বালুচর তোরছিল ধুধু(অন্তরহীন)নিঃঅন্তর।
কিনারায় ছিল ঘোন সবুজের কাঁশবন
সাদা সাদা ফুলে দিয়ে যেত শিহরণ-
হরিণী আঁখির মত- দৃষ্টিপাত করেনি
উড়ে যায় গাংচিল-হৃদয় পাঁজরে বসেছিল
চুমুকে স্পর্শ ছোঁয়া-কমল ঠোঁটের নিশান-
তাতেই যেন বড় বড় ঢেউ তুলা গর্জন
ক্লান্তি দেহে গাংচিল খুঁজেছে ঘামহীন অন্তর।
তারা খেয়ে-কেন বার বার ফিরে আসা

বুঝেনি যমুনা- খরা রোদ্রে পুড়ে যাওয়া
লম্বা ডানায় উড়াল দিবার নাই সান্ত্বনা
অভয় জলে ডুব দিয়ে যাই বার বার
এটাই যেন তার-একটু সুখ খুঁজে পাওয়া
তাতেই বুঝি বদলাও মৌসুমী মৃদু হাওয়া-

আজো দেখি খাঁখাঁ করছে তোর নিঃঅন্তর।

মন্তব্য থেকে
*আরিফুর রহমান: আপনার লেখাগুলো চলতে থাকুক অবিরত।*
*কাউছার আলম: কবিতাটি ভাল লেগেছে। চালিয়ে যান অবিরত।*
*গৌমুমোকৃঈ: বেশ ভালো লেগেছে। শুভকামনা রইল।*
*এ হুসাইন মিন্টু: সুন্দর*
*মিলন বনিক: অত্যন্ত চমৎকার অনুভূতি... কবির ভাবনার গভীরতা মুগ্ধ করেছে...*

কবিতা

## কানে গুজেছি একটা হেডফোন

রূপা

কানে গুজেছি একটা হেডফোন
তাইতো আমি শুনতে পাইনা
পথের ধারের অসহায় কোন পথশিশুর
ক্ষুধার জ্বালার বুকফাটানো আর্তনাদ।

যে শিশু আজ পড়ে আছে পথের ধুলোয়
তাকেই তো একদিন নিতে হবে দায়িত্ব
দেশকে সুন্দর করে গড়ে তোলার
সেই ভবিষ্যতেরই আজ এমন বেহাল দশা।

অথচ আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছিনা
আমি যে কানে হেডফোন গুজে রেখেছি
তাই তো আমি নিশ্চিন্তে আছি
কোন দুশ্চিন্তা আমাকে স্পর্শ করছে না।

আমাকে শুনতে হয় না
দুর্ঘটনায় অকালে ঝরে যাওয়া
কোন তরুণের মায়ের আহাজারি
স্তব্ধ হয়ে যাওয়া বাবার কান্না

যে তরুণের এখন নিত্য নতুন উদ্দ্যমে
সামনে এগিয়ে যাওয়ার কথা
সেই এখন কবরে করে নিয়েছে
নিরিবিলি শান্তির এক আপন ঠিকানা।

আমাকে ভাবতে হচ্ছে না
সেই মা বাবার কষ্টের কথা
আমার কানে যে তালা দেয়া
তাইতো শুনতে পাচ্ছিনা কোন কিছুই।

আমি খুলবো না আমার হেডফোন
আমি শুনবো না কারো আর্তনাদ
আমি বিভোর হয়ে থাকবো
আনন্দ উল্লাসের সঙ্গীত নিয়ে।

আমি যে আধুনিক এক নাগরিক
আমার তো এসব শুনার কথা না
আমি শুনবো ওয়েস্টার্ন সঙ্গীত
আধুনিকতা কে জাহির করার জন্য।

মন্তব্য থেকে
*কাউছার আলম: কঠিন বাস্তবতা তুলে ধরেছেন*
*আরিফুর রহমান: বাস্তবতাটা তুলে ধরেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ।*
*এ হুসাইন মিন্টু: সুন্দর, এই হেডফোনটা বোধ হয় স্বার্থের হেডফোন।*
*সপ্নিল রায়: আপনার কবিতার মূল কথা মর্মস্পর্শী এবং বাস্তবতা কিন্তু উপস্থাপনা আরও ভাল হতে পারতো অন্তত আধুনিক কবিতার ঢঙে।*

ছড়া

## বোনাস

এ টি এম মোস্তফা কামাল

পকেটে ঢুকিয়ে ফেলি
সদ্যজাত এক ফালি চাঁদ।
মালিক দেবেনা কিছু-
দুঃখী সোনা বউ, শোন-
এটাই এবারের ঈদের বোনাস ..... !

মন্তব্য থেকে

*আরিফুর রহমান: আপনাকে চলন্তিকাতে স্বাগত জানাচ্ছি। শুভেচ্ছা রইল। সবসময় চলন্তিকার সাথে থাকবেন।*

*আহমেদ ফয়েজ: আরো লিখুন ভাই। অনেক অনেক লেখা পড়তে চাই।*

কবিতা

## আমি কিছু বললে দরজা বন্ধ করে

মোঃ মোহাইমিন আহমেদ ৷ *কবিতা লিখতে আর নাটক পড়তে ভালোবাসি। মাঝে মাঝে গল্প লেখার চেষ্টা করি। পৃথিবীর সব জানতে ও বুঝতে পছন্দ।*

জীবন ভুলে সুখ ছেড়ে চাই আমি কি
প্রেমপত্র লিখে পরে বাহিরে ফেলেছি
বর্ণ মিথ্যে বলল তবু রই বিশ্বাসী
নোনা পানীয় মিষ্টি বলে পান করেছি
মোহেতে দেখি লাগে ভাল কেউ বুঝনি
তাদের ভুলে আজি আমি মত্ত হয়েছি
ইচ্ছা জাগে যখন লেখক হব আমি
খালি ঘড়ে একাকী কলম শুধু সঙ্গী

নিজের সাথে আর তুমি খেলা করনা
নব আলোয় আসলে কালো রইবেনা
ফিরে পাবে অনুভূতি সব হবে জানা
কলি এক ফুল হয়েছে অলি আসেনা
কথা বলে মন ময়ূরী হাজার ডঙে
আমি কিছু বললে দরজা বন্ধ করে।

মন্তব্য থেকে

*আহমেদ ইশতিয়াক: আপনার কবিতাটি পড়লাম। কবিতার বিষয় একটু অস্পষ্ট লাগলো। মানে আমার কাছে আর কি! আশা করি নিয়মিত লিখবেন। আর শুভকামনা রইল আপনার প্রতি...*

*আরিফুর রহমান: নিয়মিত লিখবেন। ভালো কিছু আশা করছি।*

কবিতা

## চির যৌবনা

আবদুল্লাহ আল নোমান দোলন

তোমাকে দেখিলে ওগো
আমি হই পুলকিত,
তোমাকে ছুঁয়ে আমি
হই গো উত্তেজিত।
তোমাকে আমার করিবার
করি কত কৌশোল,
হস্তগত করিবার লাগি
যত হিংস্র ছোবল।

তুমি আমার;শুধু আমার
একান্তই আমার,
বৈধ-অবৈধ যাই হোক
আর কেহ নয় তোমার।
শয়নে-স্বপনে-রাত্রি যাপনে
তুমি চিন্তা-চেতনায়,
লাভার মত ফুটতে থাকি
তোমাকে ছোঁয়ার নেশায়।

তুমি চির যৌবনা
চির কর্মক্ষম,
ম্লান হয় না তোমার জৌলুস
তৃপ্ত কর চরম।
ভুলে যাই সকল বন্ধন
ভুলে যাই আত্মীয়তা,
তোমাকে পাওয়ার লোভে
ভুলে যাই সব সখ্যতা।

তুমি যার হাতে শুধু তার
শুধু তার-ই মান বশ্যতা।
কত হাত ছুঁয়ে এলে
বর্তমানের-ই কেবল রক্ষিতা।
বিশ্বজুড়ে তোমার স্বীকৃতি
বিশ্ব জুড়ে আধিপত্য,
তোমাকে একান্তে পাওয়ার নেশায়
কত মিথ্যে হয়েছে সত্য।

দেশ-বিদেশ ঘুরে ঘুরে
কত নামে হয় তোমায় ডাকা,
কেউ বলে ডলার-কেউ বলে রুপী
আর কেউ বা বলে টাকা।

মন্তব্য থেকে
*আমির হোসেন: আপনার লেখাটি পড়লাম। বেশ ভাল লাগল। আশা করি নিয়মিত লিখবেন।*

*এ হুসাইন মিন্টু: আপনাকে অভিনন্দন, কবিতাটি ভালো লেগেছে ।*
*শ্যাম পুলক: সুন্দর কবিতা। শুভেচ্ছা রইল।*
*রূপা: অসাধারণ লিখেছেন ।*
*গৌমুমোকৃঈ: ভালো লেগেছে। শুভকামনা রইল।*
*কাউছার আলম: সুন্দর কবিতা। আপনাকে অভিনন্দন।*

জীবনের গল্প

## বিয়ে বিয়ে খেলা

জিল্লুর রহমান ☙ *আমি পেশায় একজন প্রকৌশলী। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে একসময় লেখালেখি শুরু করেছিলাম। বর্তমানে আমার লেখা উপন্যাসের সংখ্যা ১৮টি। এখনো লেখা চলছে অবিরত।*

মেয়েটির বয়স আর কতোই বা হবে বড় জোর এগারো বা বারো। অথচ বিয়ের জন্য পাত্র সন্ধানের কাজ শুরু হয়েছে আরো বছর খানেক আগে। গায়ে গহনা, পায়ে আল্তা, নাকে নোলক, মাথায় ঘোমটা লাগিয়ে নারীত্ব শেখানোর কাজ শুরু হয়েছে সেই সাত/আট বছর বয়স থেকেই। ইতোমধ্যেই পড়শীদের মধ্যে কানাঘুষাও কম শুরু হয়নি। তাই মেয়েটির বাপ-মা'র দুঃশ্চিন্তার অন্ত নেই, যেমন করেই হোক যত তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করা যায় ততই মঙ্গল।
মেয়েটির নাম বাতাসী। পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ডুডুমারী গ্রামে তার জম্ম। বাতাসী পাঁচ বোনের মধ্যে সবার বড়। বাতাসীর বাবার নাম ফরিদুল, মায়ের নাম আমিনা। পুত্র সন্তানের আশায় একে একে পাঁচটি মেয়ে এসেছে তাদের সংসারে, তাই বড় টান পোড়েনের সংসার, মানবেতর জীবন-যাপন, না মরে বেঁচে থাকা। ফরিদুল দিনমজুর, নিজের সুস্থ সবল দেহ আর হাত দু'খানাই তার জীবিকার একমাত্রসম্বলকোন কারণে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা কোনদিন কাজ না পেলে অনাহারে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই, তারপর পাঁচটি মেয়ের বিয়ে দেওয়ার দুঃশ্চিন্তায় ফরিদুল যেন দিশেহারা প্রায়।
অবশেষে অনেক খোঁজাখুজির পর হাড়িভাসায় এক পাত্রের সন্ধান মিললো। পাত্রের নাম বাবলু, বয়স ত্রিশ বছর, প্রথম স্ত্রীর কোন সন্তান-সন্ততি নেই বলে পাত্র মহাশয় দ্বিতীয় বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে করলে যে যৌতুকের কিছু টাকা পাওয়া যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর বাল্য বিবাহ এবং বহু বিবাহ প্রথা যে রাষ্ট্রীয় আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ এ নীতিবাক্য বেতার, টেলিভিশন থেকে এখনো প্রত্যন্ত অঞ্চলের সব মানুষের কানে পৌঁছায়নি, তাই এ এলাকায় একাধিক বিয়ের ঘটনা অনেক। তবে বাতাসীর ভাবী স্বামীরইবা দোষ কীসের?

বিবাহ স্থির হলো, যৌতুক বাবদ নগদ পাঁচ হাজার টাকা, একটা ভ্যান আর একটা ক্যাসেট প্লেয়ার। সেদিন সন্ধ্যায় বাবলু হাট থেকে ফিরে করিছন, কছিরন বলে ঘরে ঢুকে বলল, কাথা ঠিক করি আসিনু (কথা ঠিক করে এলাম)। কছিরন সহসা বাবলুর কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, কীসের কাথা (কীসের কথা)?
বাবলু সহাস্যে বলে উঠল, মোর বিহার কাথা (আমার বিয়ের কথা)।
কছিরনের মাথায় যেন বজ্রপাত পড়ল, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে হৃদয়ের ভিতরটা চুরমার হয়ে গেল। কছিরন অস্ফুটস্বরেবলল, তোমহরা আরো বিহা করিবেন (তুমি আবার বিয়ে করবে)? বাবলু মুখ বিকৃত করে বলল, বিহা করিবানাহু তে কি করিম? ভেলদিন তো দেখিনু, তোক বিহা করিবার ভেলদিন হইল আর কতদিন দেখিম? এলহাও তুই মোক একটা ছোয়া দিবা পারিলু নি, মোর কি বাপ হবা মনায় না? মোর কি বংশের বাতি ধরাবার কেহর দরকার নাই? (বিয়ে করবো না তো কী করবো? অনেকদিন তো দেখলাম, তোমাকে বিয়ে করার অনেকদিন হলো আর কতদিন দেখবো? এখনো তুমি আমাকে একটা সন্তান দিতে পারলে না, আমার কি বাবা হওয়ার সাধ নেই? আমার বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার দারকার নেই)?
তামান দোষ মোর কপালের নাহইলে বিহার ভেলদিন হইল, কত মাজারত গেনু, কত হুজুরের পানি পরহা খানু তাহ আল্লা

মোক এক খানা ছোয়া দিল নাই। মুই আল্লারঠে কী দোষ করিনু যে আল্লা মোক একখান ছোয়া দিল নাই, (সব দোষ আমার ভাগ্যের, নাহলে বিয়ের অনেক দিন হলো, কত মাজারে তো গেলাম, কত মাওলানার পানি পড়া খেলাম তবু আল্লাহ আমাকে একটা সন্তান দিলো না। আমি আল্লাহর কাছে কী দোষ করেছি যে আল্লাহ আমাকে একটা সন্তান দিলো না।) বলে কছিরন কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

বাতাসী তার বিয়ের কথা জানতে পারলো বিয়ের আগের দিন। দুপুরে হাতে কাপড় ঝুলিয়ে বাতাসী যখন পুকুরে গোসল করার জন্য যাচ্ছিল তখন তার এক দুরসম্পর্কীয় ভাবী বাতাসীকে অদূরে একটা গাছের নিচে বসিয়ে বলল, বাতাসী শুনিনু তোর নাকি বিহা? (বাতাসী শুনলাম তোর নাকি বিয়ে)?
বাতাসী বিয়ের কথা কিছুই জানে না তাই ভাবীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।
তোর বিহা তুই হে কহিবা পারিন না? এলাও শুনিননাই? আইসেক এইঠে বইসেক। তোর নগদ কুনিক কাথা কহু? (তোর বিয়ে তুই বলতে পারিস না? এখনো শুনিসনি? আয় এখানে বস। তোর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করি)? বলে বাতাসীকে কাছে বসিয়ে মাথার উকুন মারার অজুহাতে করে কথা বলতে শুরু করল, কাইল তোর বিহা, তুই স্বামীরবাড়ি যাবু, তোর বোধে ভাল লাগে না? (কাল তোর বিয়ে, তুই স্বামীর বাড়ি যাবি, তোর মনে হয় ভালো লাগে না?
বিয়ে, স্বামী, সংসার সম্পর্কে এগারো/বারো বছর বয়সের বালিকা বাতাসীর ধারণা নেই তাই সে কোন উত্তর দিতে পারলো না, আর অবোধ বালিকাকে কাছে পেয়ে জ্ঞান বিতরণের সুযোগে ভাবীটিও স্বামী দেবতাকে সন্তোষ্ট করার বিভিন্ন কৌশল অনবরত বিড় বিড় করে বলতে থাকলো, স্বামীসেবা করে বেহেস্তেরচাবি হাতে নেওয়ার সহজ উপায় ও সংসারের সবার মন জয় করে নিজের সুখ বিসর্জন দেওয়ার তৃপ্তিটিও বালিকার কানে ঢুকানো হলো। আর বাতাসী বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক হ্যাঁ কিংবা না, বলে সাড়া দিলো।
বর এলো, বরযাত্রী এলো, ২/১ টি পটকা ফুটিয়ে বিয়ের আনন্দধ্বনিও ঘোষিত হলো। দু'পক্ষের বেহাই-বেহাইনদের মধ্যে রং তামাশারও অন্ত রইল না, শুধু যার জন্য এতকিছুর আয়োজন তার মুখে কোন কথা ফুটলো না। তার চোখে, মুখে একটা গাঢ় কালিমা মাখা শংকার ছাপ ফুটে উঠল, তা কারো চোখে ধরা পড়ল, কারো চোখে ধরাই পড়ল না। কিন্তু তাতে আর কী বিয়ের দিনে মেয়েদের চোখে-মুখে কিছুটা উদ্বিগ্নের ছাপ থাকাই স্বাভাবিকবর পক্ষের একজন দাড়িওয়ালা, পাঞ্জাবী-পায়জামা পরিহিত মুরুব্বী কিছিমের লোক দেখা গেল। শোনা গেল তিনিই বিবাহ পড়াবেন। ভুঁড়ি ভোজ শেষে তিনি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে সাদা কাগজ, কলম নিয়ে লেখালেখির কাজ শুরু করলেন। লেখা শেষে কয়েকজন সাক্ষীসহ পাত্রের সম্মতি জানা গেল। কিন্তু পাত্রীর সম্মতি নিতে গিয়ে দেখা গেল বিপত্তি। সাক্ষীগণ মৌলভী সাহেবসহ পাত্রীর কাছে গিয়ে দেখেন বেচারী সংজ্ঞাহীন।
আবার কেউ কেউ রাত্রি গভীর হওয়ার অজুহাতে তখনই পাত্রীর সম্মতি জানার জন্য অস্থির হয়ে পড়ল। অবশেষে মৌলভী সাহেব তার লেখা কয়েকটি লাইন পড়ে পাত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন কবুল।
কিন্তু বালিকার বয়স এগারো/বারো বছর হলেও অন্য কারো কণ্ঠেই হোক, ভাবীর কণ্ঠেই হোক আর সংজ্ঞাহীন পাত্রীর কণ্ঠেই হোক তা জানার কারো অবকাশ রইল না। সকলে ঢেকুর ছেড়ে পান চিবাতে চিবাতে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে সুংসবাদের আনন্দধ্বনি ছড়াতে লাগল। শুধু যার বিয়ে তার সম্মতির কথা জানা গেল না। জীবনের এমন আনন্দের দিনকে উপভোগ করা তো দূরের কথা, জীবনের একান্ত আপন পুরুষটিকেও একবার চোখে দেখার সুযোগ হলো না। একটা অবোধ বালিকা নিজের ইচ্ছা, অধিকার, স্বাধীনতাবুঝবার আগেই সমস্ত আশা আকাংখা বিসর্জন দিয়ে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে দায়মুক্ত করে ত্রিশোর্ধ একজন পুরুষের কাছে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সঁপে দিয়ে সতীনের সঙ্গে সংসার করতে চলল।

মন্তব্য থেকে

*আমির হোসেন: আপনার জীবনের গল্পটি আমার কাছে এত ভালো লেগেছে যে গল্পটি পড়ে আমার কান্না এসে গেছে। আপনার গল্পে যেমন একজন কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার অসায়ত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে, তেমনি ফুটে উঠেছে একজন অসাহায় নারীর করুণ কাহিনী। নারী সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত হচ্ছে আজ। সন্তান না থাকার কারণে যেমন স্বামীর কাছে নারীর মূল্য নেই, তেমনি কন্যা সন্তান বেশী হওয়ার কারণে বাবার কাছে নারীর কোন মূল্য নেই। এই বাস্তব কাহিনীটি আপনার গল্পের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যান্ত সুন্দর সাবলীল ও আঞ্চলিক ভাষায়। পাশাপাশি বাল্য বিবাহ ও একাধিক বিবাহের চিত্রও ফুটে উঠেছে। তাই এই সুন্দর জীবনের গল্পটি রচনা করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভাল থাকবেন। সব সময় আমাদের পাশে থাকবেন। নিয়মিত লিখবেন। এই কামনা করি।*

*এ টি এম মোস্তফা কামাল: লেখার সাবলীলতায় মুগ্ধ হলাম। চলন্তিকায় স্বাগতম। আমিও আপনার মতোই নতুন।*

*আনোয়ার জাহান ঐরি: প্রথম আলোতে আপনার লেখার সাথে আমার পরিচয় আছে। এখানেও আপনার সুসাহিত্য নিয়মিত পাবার আশা করছি। স্বাগত আপনাকে।*

*আহমেদ ফয়েজ: চলন্তিকা সাইটে এমন একটি লেখা চলন্তিকার মানকে বৃদ্ধি করেছে। আপনাকে অভিনন্দন ও স্বাগতম।*

কবিতা

## শিরোনামহীন কষ্ট

বৈশাখী ঝড় ৷ *নিক নেম বৈশাখী ঝড়। উত্তরাঞ্চলের এক দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকায় আমার জন্ম। ছোট বেলা থেকেই বিভিন্ন প্রতিকূল আবহাওয়ার সাথে লড়াই করে বড় হয়েছি। কিন্তু সত্য প্রকাশে একপা পিছুহটি নি। বাঁকা জিনিস কে সোজা করার চেষ্টা করছি নিরন্তর। ক্ষুব্ধ হই তখন যখন কেউ আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। প্রশংসা অপেক্ষা সমালোচনাই আমার ভালো লাগে। লেখার প্রতি পাগলামীটা ছোটবেলা থেকেই। ঢাকায় এসে জীবনযুদ্ধে জড়িয়ে- পড়াতে মাঝখানে কিছু দিন বিরতি। জীবনের সাথে যুদ্ধ করতে করতেই বিএসএস এবং এমএসএস টা শেষ করেছি। যখন কিছু মনে হয় তখনই লিখতে বসি। খুব বড় মাপের একজন লেখক হওয়ার ইচ্ছা মনে পুষে রাখছি সবসময়। আমার কাছে সত্য চির সুন্দর। যদি কেউ সত্য বন্ধ করার জন্য মুখ বন্ধ করে দেয় তাহলে সত্যটা হাতের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে অনিচ্ছায়। অন্যায়, অবিচার আর মিথ্যার বিরুদ্ধে বৈশাখী ঝড়ের মতোই আমার তান্ডব চলে অবিরত।*

বেদনার নীল টীকা আমি একেঁ দেব
আজ তোমার ললাটে
তবে তুমি বুঝবে দুঃখ কাকে বলে,
বুঝতে চাওনি তুমি আমায়
আমার হৃদয়ের অনবরত রক্তক্ষরণ
তোমার অনুভূতিকে নাড়া দেয়নি।
আকাশের কালো মেঘের বর্ষন
তোমার মাথায় ঢেলে দেব আজ
তবে তুমি বুঝবে কষ্ট কাকে বলে
ঘোর অমানিশায় গাঁ ছমছম রাতে
নিশাচর পাখির গান শোনাব তোমায়
তবে তুমি বুঝবে প্রিয়জনকে হারিয়ে
কত কষ্ট বুকে নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হয়।

মন্তব্য থেকে
*কাউছার আলম: কবিতাটি ভাল লাগল।*
*মোঃ ওবায়দুল ইসলাম: ধন্যবাদ। ভালো লাগল। হাল ছাড়া যাবে না।*
*আহমেদ ইশতিয়াক: আমার কাছে ভালো লেগেছে। আরও ভিন্ন ধরণের কবিতা চাই। শুভেচ্ছা রইল.*
*আরিফুর রহমান: কবিতাটি ভাল লাগল। শুভেচ্ছা রইল।*

কবিতা

## অনুভব

মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন আরিফ

কখনো অনুভব হয়
আমার মুখ দিয়ে তুমিই কথা বলছ
আমার কান দিয়ে তুমিই শুনছ
আমার হাত দিয়ে তুমিই সব কিছু করছ
আমার পা দিয়ে তুমিই হেঁটে চলছ
আমার মন-মগজ দিয়ে তুমিই চিন্তা করছ
আমার চক্ষু দিয়ে তুমিই দেখছ

আবার কখনো মনে হয়
তোমার মুখ দিয়ে আমি কথা বলছি
তোমার কান দিয়ে আমি শুনছি
তোমার হাত দিয়ে আমি সব কাজ করছি
তোমার পা দিয়ে আমি হেঁটে চলছি
তোমার মন-মগজ দিয়ে আমি চিন্তা করছি
তোমার চক্ষু দিয়ে আমি সব কিছু দেখছি

আবার কখনো অনুভব হয়
তোমার মুখ দিয়েই তুমি সব কিছু বলছ
তোমার কান দিয়েই তুমি শুনছ
তোমার হাত দিয়েই তুমি সব কাজ করছ
তোমার পা দিয়েই তুমি হেঁটে চলছ
তোমার মন-মগজ দিয়েই তুমি চিন্তা ভাবনা করছ
তোমার চক্ষু দিয়েই তুমি দেখছ
মাঝখানে আমার কোন অস্তিত্বই নেই।

মন্তব্য থেকে
*আরিফুর রহমান: ভাই কিছু বলার নেই। পড়ে না হেসে পারলাম না। খুব ভাল লাগল। ধন্যবাদ।*
*কাউছার আলম: সুন্দর কতগুলো অনুভব তুলে ধরেছেন*

গল্প

# প্রথম কদম ফুল

আহমেদ ইশতিয়াক ৷ *আমি কিছুই পারি না !*

সকাল থেকেই আকাশের মন খারাপ। মানুষের মন খারাপ হলে মুখ কালো হয়ে যায়। আকাশের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আকাশ কালো হয়ে আছে। বেশি কালো না। অল্প কালো। মাত্র মেঘ জমা শুরু করেছে। তাই অল্প কালো। আকাশকে সান্ত্বনা দেয়ার মত কেউ নেই। তাই তার মন খারাপ সহজে ভালো হবে না। সে আরও কালো হবে। একসময় কাঁদবে। সেই কান্নাকে সবাই বৃষ্টি বলে। অনেকে সেই বৃষ্টিতে ভিজতেও চায়।

নীলিমা অনেকদিন বৃষ্টিতে ভেজে না। শেষ কবে বৃষ্টিতে ভিজেছে সেটা তার মনে নেই। তার বৃষ্টিতে ভেজা নিষেধ। নিষেধ করেছে তার মা। তার মা কঠিন রাগী। কঠিন রাগকে উপেক্ষা করার সাহস নীলিমার নেই। তবে আজকে নীলিমার মন খারাপ। আকাশের মন খারাপ দেখে তারও মন খারাপ হয়ে গেছে। মেয়ের মন খারাপ দেখলে কঠিন রাগী মায়েরাও তরল হয়।

মা!
-কিছু বলবি?
আজকে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আমি ভিজবো।
-কোথায় ভিজবি?
ছাদে
-না
ভিজলে সমস্যা কি?
-বেশি বুঝিস না। যা...

নীলিমা মন খারাপ করে চলে আসে। এর আগেও একবার ভিজতে চেয়েছিল। মা দেয় নি। আশেপাশের ছাদে অনেক ছেলেরা ওঠে। বৃষ্টিতে ভিজলে গায়ের জামাকাপড় ভিজে যাবে। লেপটে থাকবে শরীরের সাথে। এটা দর্শনীয় দৃশ্য। ছেলেরা দর্শনীয় দৃশ্য চোখছাড়া করতে চায় না। এ কারণেই নীলিমার ছাদে উঠে বৃষ্টিতে ভেজা নিষেধ। এত সুন্দর বৃষ্টিতে একটা অসুন্দর কারণে ভেজা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা ঠিক না।

হ্যালো... নীলিমা?
-রুদ্র?
-হুম... তাড়াতাড়ি ক্যাম্পাসে আয়। আজকে এক্সট্রা ক্লাশের শিডিউল। একটাই ক্লাশ। জলদি আয়। উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার!

নীলিমা ব্যস্ত হাতে ব্যাগ গোছায়। ক্লাশটার শিডিউল যে আজকে সেটা তার জানা ছিল না। রুদ্রকে কাচ্চি খাওয়াতে হবে। বেচারা কয়েকদিন থেকে ঘ্যানর ঘ্যানর করছে। কাচ্চি খাওয়ার জন্যে। এই খাবার মানুষের এত পছন্দ হয় কি করে সেটাই নীলিমার মাথায় আসে না।

কোথায় যাচ্ছিস?
-ক্লাশ আছে মা। ইম্পরট্যান্ট।
বৃষ্টি নামবে। গাড়ি নিয়ে যা।
-গাড়ি লাগবে না। রিকশায় করে চলে যাচ্ছি। ক্লাশ শেষ করেই ফিরব। দেরি হবে না।

বলেই নীলিমা হুট করে বেড়িয়ে যায়। বাইরে নেমেই আকাশের দিকে একবার তাকায়। আগের চেয়ে আরও একটু বেশি কালো হয়েছে। ভালো দেখাচ্ছে খুব। মন খারাপ করলে সবাইকেই সুন্দর দেখায়। আকাশকেও।

নীলিমা ক্যাম্পাসে পৌঁছেই দেখে ফুটপাথে হেলান দিয়ে রুদ্র বসে আছে। সেই দোমড়ানো শার্টটাই পরা। ছেলেটা পাগল। এক জামা কেউ এতদিন পরে?

কি রে? ক্লাশে যাবি না?
-কিসের ক্লাশ?
কিসের ক্লাশ মানে?
-কোন ক্লাশ নেই। আজ তুই আমি বৃষ্টিতে ভিজব। টিএসসির প্রতিটা পথে হাঁটবো। তারপর নীলক্ষেতে আমাকে কাচ্চি খাওয়াবি। টাকা আছে তো সাথে?
নে... দুটো কদম এনেছি তোর জন্যে। চার টাকা নিল। টাকা ছিল না। নাহলে আরও গাদাখানিক নিয়ে আসতাম।

নীলিমা অন্য দিকে তাকায়। তার চোখে পানি এসে গেছে। কারণে অকারণেই তার চোখে পানি আসে। তবে আজকে কারণ আছে।
আকাশ আরও বেশি কালো হয়ে আসছে। সাথে ঠাণ্ডা বাতাস। বৃষ্টি নামি নামি করছে। নীলিমা খুব চাইছে এখনই বৃষ্টি

নামুক। বৃষ্টি নামলে তার চোখের পানিটা রুদ্র বুঝবে না। ভালোবাসা এত সহজে বুঝলে হবে না। আরও কঠিন হক। তারপর বুঝা যাবে।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়। আগে বিটিভি বন্ধের পর টেলিভিশন যেভাবে ঝিরঝির করত, সেভাবে। ওতে নীলিমার কান্না লুকোয় না। চোখের জল ঝুম বৃষ্টির মধ্যেও আলাদা করা যায়।

অদ্ভুত ! অবশ্য ভালোবাসা তো অদ্ভুত ই !!

মন্তব্য থেকে

*আমির হোসেন: ভাল লিখেছেন। নিয়মিত লিখুন।*
*আরিফুর রহমান: আপনার লেখাগুলো চলতে থাকুক অবিরত*
*গৌমূমোকৃঈ: বেশ ভালো লেগেছে। শুভকামনা রইল।*
*এ হুসাইন মিন্টু: সুন্দর*
*আরিফুর রহমান: বেশ ভাল লেগেছে চালিয়ে যান*

পর্যটন

## তারুয়া সমুদ্র সৈকত যেন কক্সবাজার-কুয়াকাটাকেও হার মানিয়েছে!!!

দ্বীপজেলা ভোলার একমাত্র সমুদ্র সৈকত তারুয়াকে পর্যটন এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার অপার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসিনতার কারণে তা হয়ে উঠছে না। অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় পর্যটকরা সেখানে যেতে পারছেন না। যারা যাচ্ছেন তারাও জীবনের ঝুঁকিসহ নানা বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন। অথচ পর্যটন মন্ত্রণালয় কিংবা স্থানীয় প্রশাসন একটু উদ্যোগ নিলে পর্যটকরা সমুদ্র সৈকতটিতে অনায়াসেই যেতে পারেন।

জেলা শহর থেকে দেড়শ কিলোমিটার দূরে এই তারুয়া সমুদ্র সৈকতের অবস্থান। একশত পয়ত্রিশ কিলোমিটার পাকা সড়কের পর পনের কিলোমিটার নৌ-পথ পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। চারিদিকে জলরাশি বেশিষ্ট সাগরের উত্তাল ঠেউয়ে পলি জমতে জমতে প্রায় ৪০ বছর পূর্বে বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে জেগে উঠে তারুয়া। তারুয়া সমুদ্র সৈকতে পর্যটকরা একই সঙ্গে উপভোগ করতে পারেন বিশাল সমুদ্রের বিস্তীর্ণ জলরাশি, নানা জাতের পাখিদের কল-কাকলি, বালুকাময় মরুপথ আর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের ছায়াঘন মনকাড়া নিবিঢ় পরিবেশে সময় কাটানোর সুযোগ, বৈচিত্রময় প্রাণী আর সাগরের উত্তাল গর্জন সব মিলিয়ে মায়াবী হাতছানী। প্রকৃতি যেন নিজ হাতে দ্বীপটিকে সাজিয়ে তুলেছেন। তবে সেখানে এখনো গড়ে উঠেনি মানুষের বসবাস। এখানে হরিণ ও ভাল্লুকসহ নানা প্রাণী ও দৃষ্টিনন্দন মাটি রয়েছে। সবুজ বৃক্ষের সমারোহ আর পাখিদের কলরবে মুখরিত তারুয়া দ্বীপ পর্যটন এলাকা হিসেবে গুরুত্বের দাবী রাখে। তারুয়ায় দাঁড়িয়ে ভোররে সূর্যের আগমনী বার্তা দেখা যায়। পাশাপাশি সন্ধ্যার আকাশে সিঁড়ি বেয়ে এক পা দুপা করে লালমিয় ভরে ওঠার সেই অতুলনীয় দৃশ্যও দেখা যায়। পর্যটক আর ভ্রমণ পিপাসু মানুষকে মুগ্ধতার বন্ধনে আবদ্ধ করার যাদুকরি শক্তি রয়েছে এই তারুয়া দ্বীপরে। আর রাতে নতুন শাড়িতে ঘোমটা ঝড়ানো নব বধূর ন্যায় নিঝুমতায় ছেয়ে যায় পুরো এলাকা। পর্যটক আর ভ্রমণ পিপাসু মানুষকে মুগ্ধতার বন্ধনে আটকে দেয়ার যাদু রয়েছে যেন তারুয়ায়। তাই দেশের তৃতীয় সমুদ্র সৈকত হিসাবে তারুয়া গড়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন ভ্রমনার্থীরা। কিন্তু তারুয়া সমুদ্র সৈকতের এই প্রাকৃতিক রূপ-সৌন্দর্যের কথা দেশবাসী তো দুরের কথা ভোলার বহু মানুষের কাছে এখনও অজানা।

তারুয়ায় শীতকালের চিত্র কিছুটা ভিন্ন ধরনের। সুদুর সাইরেরিয়া থেকে ছুটে আসা অতিথি পাখিদের আগমনে যেন নতুন রূপ ধারন করে এলাকাটি। তখন পাখিদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয় তারুয়া।

সমুদ্র সৈকতটিতে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত কোন নৌ-যান নেই। বিশেষ ব্যবস্থায় কিংবা রিজার্ভ করা স্পীড বোট, ট্রলার বা ইঞ্জিন চালিত নৌকা ভাড়া করে সৈকতে যেতে হয় পর্যটকদের। সৈকতে নামার জন্য কোন পন্টুন বা টার্মিনাল নেই সেখানে। যে কারণে পর্যটকরা সেখানে যাবার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে পারছেন না। যারা এই কঠিন বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে প্রকৃতির টানে সেখানে যান, গিয়ে মুগ্ধ হন ঠিকই কিন্তু নিরাপত্তাসহ সুপেয় পানি বা বিশ্রামাগারের অভাবে চরম বিড়ম্বনার শিকার হন।

এখানে যদি হোটেল-রেস্তোরাঁ থাকতো তাহলে মানুষ এখানে এসে ৫-৬ দিন থাকতে পারতো। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে এখানে আরো বেশি পর্যটক এসে ভীড় জমাবে। এখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে।

স্থানীয় বাসিন্দারাও দীর্ঘদিন ধরে সরকারের কাছে তারুয়া সমুদ্র সৈকতটিকে একটি পর্যটন এলাকা হিসেবে ঘোষণার দাবী জানিয়ে আসছেন। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। তারা জানান, পর্যটন কেন্দ্র করার জন্য একটি টার্মিনাল, একটি পুলিশ ফাড়ি, একটি রেস্ট হাউজ প্রয়োজন। তাহলে আমাদের এলাকা উন্নত হবে। আমি আপনাদের মাধ্যমে সরকারের কাছে দাবী করছি, ঢালচরের হাজারো মানুষের প্রাণের দাবী। আজকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তাদের মত করে আমাদের এই এলাকাটা যেন পর্যটন এড়িয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

**কিভাবে যাবেন:**

বন ও সাগরে তারুয়া দ্বীপ ভোলা শহর থেকে তারুয়ায় যেতে সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না হলেও নৌ-পথে যাওয়ারসহজ উপায় রয়েছে।

**কোথায় থাকবেন:**

তারুয়া দ্বীপ এখনো ওতোটা প্রসিদ্ধ না হয়াই সেখানে তেমন কোন থাকার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তবে আপনি ভোলা শহরে থেকেই তারুয়া দ্বীপের সৌন্দর্য উপবোগ করতে পারেন।

তথ্য সূত্রঃ বিভিন্ন দৈনিক।

বিজটেনর আসছে ...

কবিতা

## প্রিয় বাংলাদেশ

পৃথিবী জুড়ে স্বপ্ন

রোজ বিহানে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে কোন দেশে
মন যে দোলে ধানের ক্ষেতে সবুজ পরিবেশে।

কোন সে দেশে সবুজ পাতায় শিশির চিকচিক করে
সাগর নদী যায় ছুটে যায় ঢেউ কলকল করে।

কোন সে দেশে লাঙল কাধে কৃষক মাঠে যায়
বর্ষা এলে দল বেধে যায় মাঝির ডিঙি নায়।

হাজার গুণে ভরা এদেশ রুপের নেইকো শেষ
সে যে আমার হৃদয় জুড়ে প্রিয় বাংলাদেশ।

মন্তব্য থেকে

*আজিম হোসেন আকাশ: খুব সুন্দর হয়েছে। আপনাকে স্বাগতম।*
*মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক খান: আমাদের দেশটা অনেক সুন্দর। তবে আমরা নিজেরাই নষ্ট করছি। চলন্তিকাতে প্রথম লেখার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।*
*আমির হোসেন: আপনার লেখাটি খুব ভাল লাগল। লিখতে থাকুন অবিরত।*
*রফিক আল জায়েদ: স্বদেশকে নিয়ে একটি সুন্দর কবিতা পড়লাম। নিয়মিত লেখা আশা করি।*
*আরিফুর রহমান: স্বদেশকে নিয়ে কবিতা পড়লাম খুব ভাল লাগল। নিয়মিত লেখা আশা করি। ধন্যবাদ।*
*এ হুসাইন মিন্টু: জন্মভূমি আমার দেশকে নিয়ে সুন্দর কবিতা*
*কাউছার আলম: চলন্তিকাতে প্রথম লেখার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।*

পর্যটন

## রূপে ঝলমল নিঝুম দ্বীপ

মোঃ অলিউর রহমান

দ্বীপের নাম নিঝুম দ্বীপ। বাংলাদেশের অন্যতম রূপসী এলাকা এটি। নিঝুম দ্বীপ হলো ম্যানগ্রোভ বনে ঘেরা। লবণাক্ত পানির তীরে মানে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় অবস্থিত বনকেই বলে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট বা বন। অর্থাৎ যে বনে লোনা পানি ঢোকে সেটাই ম্যানগ্রোভ বন। পৃথিবীর সবচে' বড় ম্যানগ্রোভ বন হলো সুন্দরবন। আর এ তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে আছে নিঝুম দ্বীপ। নিঝুম দ্বীপের অবস্থান হাতিয়া ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে। মেঘনা নদীর মোহনায় নোয়াখালী জেলায় নিঝুম দ্বীপের অবস্থান। নিঝুম দ্বীপ বঙ্গোপসাগরের কাছে হলেও এর চারপাশে সাগর নেই। আছে মেঘনা নদী।

মজার ব্যাপার হলো অনন্য সুন্দর এই দ্বীপটি অনেক দিন কিন্তু পানির ভেতরে লুকিয়ে ছিল। ১৯৭২ সালের দিকে বন বিভাগের লোকজন এ দ্বীপটি আবিষ্কার করে। তখন তারা দ্বীপটিতে কেওড়া গাছ লাগিয়ে দিয়েছিল। কেওড়া গাছের বৈশিষ্ট্য হলো এতে শ্বাসমূল থাকে। বনে লোনা পানি ঢুকে গেলে গাছগুলো আর মাটি থেকে শ্বাস নিতে পারে না। তখন শ্বাসমূলগুলো দিয়ে তারা নিঃশ্বাস নেয়। এ জন্য যেখানে পানি বেশি ওঠে সেখানে শ্বাসমূলও বেশি লম্বা হয়। শ্বাসমূল থাকে বলেই কেওড়া গাছ লোনা জলেও ভালোভাবে বাঁচতে পারে। তবে দ্বীপের যে অংশে মানুষ থাকে সেখানে বিভিন্ন ফুলেরও দেখা মেলে। তবে সেগুলো মানুষই আশপাশের দ্বীপগুলো থেকে আসার সময় নিয়ে এসেছে।

নিঝুম দ্বীপের বনে আগে তেমন কোনো প্রাণীই ছিল না। এখন কেবল হরিণ আছে। হরিণের মোট সংখ্যা কম করে হলেও এখন ২০ হাজার। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ সরকার সুন্দরবন থেকে মাত্র ৮টি হরিণ এনে এখানে ছেড়ে দিয়েছিল। সেগুলোই এখনকার ২০ হাজার হরিণের পূর্বপুরুষ। বক, চখাচখি, গাংচিল, আরও কত পাখি! সব মিলিয়ে কম করে হলেও ৩৫ প্রজাতির পাখি আছে সেখানে। শীতকালে আবার এদের সঙ্গে যোগ দেয় নানা নামের আর নানা রংয়ের অতিথি পাখি।

নিঝুম দ্বীপ সত্যিই অসাধারণ জায়গা। যেমন সুন্দর, তেমনি রোমাঞ্চকর। নদী আছে, বন আছে, গ্রামের সরল মানুষ আছে, অসাধারণ সুন্দর সব পাখি আছে আর আছে হরিণ। দ্বীপে নেমেই যে কাজটি করা যেতে পারে তা হলো নদীতে গোসল করা। তবে বেশিক্ষণ লাফালাফি করা যাবে না। লোনা পানিতে বেশিক্ষণ থাকলে সমস্যা হয়। গা চুলকায়। সুতরাং গিয়ে ঝটপট নদীতে গোসল সেরে নিতে হবে। আর লোনা পানিতে গোসল করতে না চাইলেও সমস্যা নেই। নদীর তীরগুলো এত সুন্দর, সেখানে সারাদিন বসে থাকতে ইচ্ছা করবে। জোয়ারের পানি চলে যাওয়ার আগে বালুময় মাটিতে নানা নকশা এঁকে

যায়। আর তার মাঝে একটু একটু পানি জমে সেই নকশাকে করে তোলে আরও জীবন্ত। তাকে আবার ছোট ছোট কচি সবুজ ঘাস রঙ্গিন করে তোলে। আর রাতে নদীর তীরে যেতে পারলে তো কথাই নেই। পূর্ণিমা হলে সারারাত চাঁদ দেখেই কাটিয়ে দিতে পারবে। আর অমাবস্যা হলে ভুতের গা-ছমছম করা গল্পের আসর যে দারুণ জমবে তা কি আর বলতে হয়!

নদীগুলোর মজা কিন্তু এখানেই শেষ নয়, বনের ভেতর চিকন চিকন খাল হয়ে ঢুকে গেছে নদীগুলো। একটা আরেকটাকে জড়িয়ে ধরেছে প্রাণের বন্ধুর মতো। এসব খাল ধরে চলে যাওয়া যায় বনের অনেক ভেতরে যেখানে হরিণ থাকে। সে জন্য অবশ্য ট্রলার ভাড়া করতে হবে। তবে ওগুলো নামেই ট্রলার। আসলে কিন্তু একটা মাছধরা নৌকায় নিয়ে যায়।

নিঝুম দ্বীপে অসংখ্য হরিণ থাকলেও গভীর বনে না গেলে হরিণের দেখা মিলবে না। গভীর বনে যেখান দিয়ে ঢুকতে হবে, সেটা কিন্তু বেশ মজার একটা জায়গা। তিন দিকে বন, মাঝখানে ফুটবল খেলার মাঠের মতো বিশাল জায়গায় কোনো গাছই নেই। সামনে যেখানে পানি সেখানেও গভীরতা খুবই কম। ডাঙা থেকে অনেক দূর চলে আসার পরও দেখা যাবে পানি কোমরের কাছেও আসেনি। তবে নৌকা থেকে নেমে হাঁটার সময় একটু সাবধানে পা ফেলতে হবে। সেখানকার মাটি এতই পিচ্ছিল যে, পা ফেলতে একটু এদিক-ওদিক করলেই ধপাস করে পড়ে যেতে হবে। আর ভুলেও স্যান্ডেল পরে হাঁটা যাবে না। অবশ্যই স্যান্ডেল খুলে হাতে নিয়ে নিতে হবে।

সেখান দিয়ে বনে ঢোকার সময়ই হয়তো হরিণের পায়ের ছাপ দেখা যাবে। ছোট ছোট দুটো খুরের পাশাপাশি দুটো গোলগোল দাগ। এখানে হরিণ আসে অনেক রাতে, পানি খেতে। তারপর হয়তো হরিণের দু'একটা কঙ্কালও দেখা যেতে পারে। এখানকার কুকুরগুলো সুযোগ পেলেই হরিণ মেরে খায়। তবে সহজে পারে না। কারণ হরিণ খুবই সতর্ক প্রাণী। আর দৌড়াতেও পারে বেশ।

বনের মধ্যে বেশ খানিকটা ভেতরে গেলে তবেই হরিণের দেখা মিলবে। তবে সেক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কারণ হরিণ যদি পায়ের শব্দ পায়, ভোঁ দৌড়। তবে হরিণের পালের দৌড় দেখাও বেশ মজার। একপাল সোনালি রংয়ের হরিণ দূর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে আর গাছের আড়াল থেকে তা দেখার মজাই আলাদা। তবে ভুল করেও কিন্তু গ্রীষ্মকালে নিঝুম দ্বীপে যাওয়া উচিত নয়। তখন বনে গিয়ে হরিণ দেখা দূরে থাকুক, ভেতরে ঢুকে দাঁড়ানোই যাবে না। মশা পারলে তুলে নিয়ে যায়।

নিঝুম দ্বীপ নোয়াখালী জেলার মধ্যে পড়লেও যাওয়ার সময় কিন্তু নোয়াখালী গেলে চলবে না। সেজন্য হাতিয়া পার হয়েও আরও অনেক দূর যেতে হবে। ঢাকা থেকে প্রথমে লঞ্চে যেতে হবে হাতিয়ার তমরুদ্দি ঘাটে। ঘাটে নেমে একটা কাঠের তৈরি অনেকটা টেম্পোর মতো বাসে করে যেতে হবে বাজারে। সেখান থেকে আবার রিকশায় করে নিঝুম দ্বীপে নামার বাজারে। এরপর একটা বড় গাং আছে, মানে নদী। মেঘনারই কোনো একটা শাখা নদী। ট্রলারে করে পার হতে লাগবে ৫ মিনিটের মতো। এটাই নিঝুম দ্বীপ। তবে এটি আসলে নিঝুম দ্বীপের একপ্রান্ত। নিঝুম দ্বীপের আসল সৌন্দর্য দেখতে হলে যেতে হবে অন্যপ্রান্তে। সে জন্য তোমাকে আবার রিকশা নিতে হবে। পুরো দ্বীপে ঐ একটাই রাস্তা। সেটাও অবশ্য পুরো পাকা নয়, বেশিরভাগই ইট বিছানো। একটু পরেই শুরু হবে কেওড়া বন। নিচু জায়গা তাই পানিও জমে থাকে। আর সেখানে কত যে পাখি। তবে তমরুদ্দি ঘাট থেকে এত কষ্ট করে না গিয়ে একবারে ট্রলারে করেও যাওয়া যায়। নিঝুম দ্বীপে কোনো আবাসিক হোটেল নেই।

তবে থাকার জায়গা আছে। একটা সরকারি বাংলো আছে, তবে সেটার ভাড়াও বেশি, সুবিধাও নেই কোনো। ফ্যান লাইট সবই আছে, কিন্তু বিদ্যুৎই তো থাকে না। বিদ্যুৎ আসে রাত ৮টার দিকে। আর চলে যায় রাত ১০টায়। তবে প্রায় সব দোকানেই দেখবে এরপরও লাইট জ্বলছে। সেগুলো জ্বালানো হয় সৌরবিদ্যুৎ দিয়ে। প্রায় প্রত্যেকটি দোকানেরই ছাদে সোলার বোর্ড লাগানো আছে। সেখানে সারাদিনে যত সূর্যের আলো পড়ে তত বিদ্যুৎ তৈরি হতে থাকে। এ বিদ্যুতই রাতে আলো দেয়।

মন্তব্য থেকে

*আজিম হোসেন আকাশ: বেশ ভাল লাগল। লিখে যান..*
*আমির হোসেন: নিঝুম দ্বীপে যাওয়ার ইচ্ছা অনেক দিনের। নানা ব্যস্ততার কারনে যেতে পারি না। আপনার লেখা পড়ে কিছুটা হলে নিঝুম দ্বীপ দেখার স্বাদ মিঠছে।*
*আরিফুর রহমান: ব্যস্ততা আমাদের এসব সৌন্দর্য থেকে দূরে রাখে। চেষ্টা করব যাওয়ার জন্য।*

গল্প

# তুমি রবে নীরবে – প্রেমের গল্প , দ্রোহের গল্প

ফিদাতো মিশকা ☙ *নিজেকে নিয়ে কিছু বলতে বললে আমি সবসময় অপ্রস্তুত হই । পড়ছি শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ , বগুড়া তে ৪র্থ বর্ষ এম বি বি এস । লেখালেখি জীবনের একটা বড় স্বপ্ন । সময়ের সল্পতা এই স্বপ্নের পথের অন্তরায় । তবুও আশা রাখি ফিরে আসব একদিন স্বপ্নের আঙ্গিনায়*

অনেকদিন  পর আজ বাইরে বের হলাম । শুভ নিলয়রা এতোটা জোর করছিল যে না করতে পারছিলাম না । বিকেল বেলা শুভ রুমে বলল , তুই কি মরে যেতে চাস , মরতে চাইলে সায়ানাইড এনে দেই ধপাস করে মরে যাবি আমরা সবাই মিলে একদিন কান্না কাটি করব । কলেজে একদিন শোকসভা হবে । সবাই কালো ব্যাজ পরবে ।  কাজ শেষ , তিলে তিলে শেষ করবি কেন । শুভর জোর করাতে বের হলাম । কতদিন পর কাম্পাসের বাইরে কোথায় ঘুরতে যাচ্ছি , ছয় মাস। ছয় মাস কোন আড্ডা কোন কোলাহলে যাই নি । নিজেকে একা করেছি অনেক বেশি একা । সারাদিন একা রুমে শুয়ে থেকেছি , ইচ্ছে হলে ক্লাস করেছি , খেয়েছি ,না খেয়ে থেকেছি । বাইরে বের হতেই মনে হল নিঃশ্বাস টা বন্ধ ছিল এতদিন , বাতাসের গন্ধ ভুলে ছিলাম । সবাই মিলে ফুড পার্কে খেতে বসলাম । শুভ গ্রিল আর নানের অর্ডার করল । ওরা কথা বলেই যাচ্ছে আমি চুপ করে শুনছি । মাঝে মাঝে হু হ্যাঁ করছি । আসলে দীর্ঘদিন চুপচাপ থাকতে থাকতে এমন হয়ে গেছে কোন কিছুতে মন বসাতে পারিনা । এলোমেলো বাতাসের মাঝে নিজেকে খুব ভাসিয়ে দেই , আনমনে গান গাইতে ইচ্ছে হয় , নিজের ভেতরে গুন গুন করি

কেন পিরিতি বারাইলা রে বন্ধু
ছেড়ে যাইবা যদি
ক্যামনে রাখিব তোর মন
আমার আপন ঘরে বাঁধি রে বন্ধু
ছেড়ে যাইবা যদি
কেন পিরিতি বারাইলা রে বন্ধু
ছেড়ে যাইবা যদি।

ফুড পার্কে অর্ডার করলে একটা বাপার হয় ওরা এক ঘণ্টার আগে খাবার দিবে না বসে থাকতে হয় । নিলয় আর শুভ বক বক করে যাচ্ছে । আমি কিছু শুনছি কিছু না । কিছু ক্ষণ পর একটা ছেলে এসে আমাদের সামনে বসল । ছেলেটি আমার পরিচিত না তবে ছেলেটির সাথে যে মেয়েটি এসে বসেছে থাকে দেখে আমার মাথা আর বেশি এলোমেলো হয়ে গেল । আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে লাগল , ছয় মাস পর মিতুর সাথে আমার দেখা । মিতুর দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম । মিতু আমাকে কি দেখতে পেয়েছে , ওর মধ্যে কোন ভাবলেশ নেই , সে হেসে হেসে ছেলেটির গল্প করে যাচ্ছে । আমি মিতুর দিকে তাকিয়ে আছি । মিতু আগের চেয়ে খানিকটা ফর্সা হয়েছে । মিতু কপালে টিপ পড়েছে । ছয় মাসে একটা মানুষ খুব বেশি বদলায় না । কিন্তু মিতুর সব গুলো পার্থক্য আমি ধরতে পারছি ।মিতু কফি কালারের একটা ড্রেস পরছে তার সাথে হালকা হলুদ ওড়না । মিতুকে এখনো সেই পরীর মত লাগে। মিতু অপরাজিতা ফুল খুব পছন্দ করে , ইশ আমার হাতে যদি একটা অপরাজিতা ফুল থাকত । ছেলেটির দিকে থাকালাম , সুন্দর ফর্সা , স্মার্ট , ঠিক যেমনটি মিতু পছন্দ করত । ছেলেটির পাশে মিতু কে খুব মানিয়েছে । ওরা দুজন বোধহয় খুব সুখী, খুব । আমার মাথাটা খুব ঝিমঝিম করছে , শুভকে বললাম দোস্ত এক মিনিট আমি একটু বাইরে থেকে আসি । আমি ফুড পার্ক থেকে বের হয়ে হাঁটতে শুরু করলাম । আমার মাথাটা আরও বেশি ঝিমঝিম করছে । মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ নাক দিয়ে কোন নিঃশ্বাস নেই নি ।

আমি মাঠের মধ্যে ঘাসে উপর শুয়ে আছি । লোকালয়ের বাইরে এই মাঠ টাকে আমি খুব পছন্দ করি , এখানে আমি প্রায় আসি , চুপ করে ঘাসের মধ্যে শুয়ে থাকি , আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে । জল গুলো নিবিড় মমতায় ঘাসগুলোকে ছুয়ে দেয় , আমি কান্নার সাথে প্রেমে মজি , কান্না ঘাসের সাথে গভীর প্রেম করে। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পরা জল্কে তোয়াক্কা না করে আমি খিল খিল করে হাসি । মাথার উপর বিশাল আকাশ টা ছোট হয়ে আসছে । আমি মিতুর মুখটা মনে করার চেষ্টা করছি । মিতুকে বিভিন্ন কোন থেকে দেখছি । হরাইযনটাল মিতু ভারটিকেল মিতু । বিশাল আকাশের ক্যানভাস জুড়ে মিতু কেবল মিতু।

মিতুর সাথে আমার দেখা হয়েছিল একটা গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে । পরীক্ষা শেষ, বাসায় চলে যাওয়ার কথা ছিল। হলের প্রায় সবাই চলে গেছে । আশেপাশে কেউ নেই । আমি টিকেট পাইনি । সন্ধায়  শামিম ফোন দিল, কিরে মুরগী একা একা করিস । চলে আয় । শামিমের বাসা শহরে । ভাবলাম হলে একা থাকার চেয়ে আড্ডা দিয়ে আসি । শামিমের বাসায়

যাওয়ার  পর বলল চল , কাজিনের গায়ে হলুদ হচ্ছে , ঘুরে আসি । শামিমের সাথে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে অর চাচার বাসায় গেলাম । সবাই চারপাশে আনন্দ করছে । আমি কোনার দিকে বসে আছি । শামিম কি একটা কাজে বাইরে চলে গেছে । একা একা ভাবছি । শীতের সময় । হঠাৎ একটি মেয়ে আমার সামনে এনে চা রাখল , বলল ,

চা খেয়ে নেন , আপনি কত টুকু চিনি খান । জানিনা , দুই চামচ দিয়েছি । আর লাগলে বলবেন । এতো অবাক হচ্ছেন কেন । আমি মিতু শামিম ভাইয়ার কাজিন । আপনি এখানে একা বসে আছেন কেন । বিয়ে বাড়ি আড্ডা দেওয়ার জায়গা , ভিজে বেড়ালের মত বসে থাকার জায়গা না । আপনি বসে থাকেন আমি আসি ।

মিতু খিল খিল করে হাসতে হাসতে চলে গেল । আমি বসে রইলাম । মেয়েটা কত সুন্দর করে হাসে । আমি বারবার সেই হাসি টা মনে করার চেষ্টা করছিলাম । কি মিস্টি , কি সুন্দর হাসি ।

রাতে ১০ টার দিকে হলে ফিরে আসলাম । মিতুর সাথে আর দেখা হয়নি । আমি বাসায় চলে আসলাম । বাসায় এক সপ্তাহের মতো ছিলাম । বার বার আমি একটি হাসি মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম । মুগ্ধ হাসি । মিতুর মুখ টা ভেসে উঠছিল। আশেপাশে , কেবল একটি বাক্য প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল , আমি মিতু , শামিম ভাইয়ের কাজিন ।

বাসা থেকে হলে ফিরে আসলাম । মিতুর কথা বারবার মনে হত । কেউ হাসলে মন হত এঁর চেয়ে অনেক সুন্দর হাসি মিতুর  ।

বাসা থেকে ফিরার দশ দিনের মাথায় , আমার ফোনে একটা কল আসল । আমি ধরতেই বলল,
- দীপ্ত ভাইয়া , কেমন আছেন । বলেন তো আমি কে?
- মিতু ( আমি কেমন যেন অবচেতন মন থেকে বললাম )
- আপনি আমাকে চিনলেন কি করে , আমি শামিম ভাইয়ের ফোন থেকে আপনার নাম্বার নিয়েছি । শুনেছি আপনি ভালো আবৃত্তি করেন । আপনার আবৃত্তির পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ফোন দিয়েছি । আপনি অন্য কিছু ভাববেন না । আজকাল কবিতাতে মেয়েরা পটে না । কাক এবং কবির সংখ্যা নিয়মিত বাড়ছে । চুপ করে আছেন কেন । আপনি দেখতেও ভেজা বিড়াল।কথা বলায় ও ভেজা বিড়াল, ।
- আমি মিন মিন করে বললাম , মিতু আমি কাক কবি না , আর শামিম ভুল বলেছে , আমার আবৃত্তি ভালো না ।
- আমি জানতাম আপনার আবৃত্তি ভালো না । আপনার একটা মাত্র গুন আপনি ভালো ছবি আঁকেন । আপনার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে হল , আমি মাঝে মাঝে অনেক কাঁদি , সেই দিন আমি অল্প পরিচিত মানুষদের সাথে কথা বলি । অল্প পরিচিত মানুষদের সাথে এলোমেলো কথা বলা যায় । পরিচিতদের সাথে বললে , তারা ভাবে মেয়েটির মাথা খারাপ।

মিতু ফোন রেখে দিল । আগের বার মিতুর হাসি ভালো লেগেছিল । এবার মিতুর কণ্ঠের প্রতি তীব্রতা বেড়েছে । আগের বার মিতুর কণ্ঠ এতো মধুর শুনায় নি ।

এরপর মিতু মাস খানেক আর ফোন দেয় নি । আমি কেমন একটা অপেক্ষা করতাম । কিন্তু ফোন দিতাম না । একদিন ভাবলাম , বাইরে মোবাইল এঁর দোকান থেকে ফোন দিলে কেমন হয় ফোন দিলাম । আমি বাইরের দোকান থেকে ফোন দিলাম । মিতু কি সুন্দর করে বলল হ্যালো । আমি ফোন রেখে দিলাম । আমার ভিতর দিয়ে শান্তির একটা ধারা বয়ে গেল । আমার মনে হল ইশ , এই মুহূর্তটাতে একটা হ্যালো শুনে মনে হচ্ছে , আমি হাপি আমি হাপি , আমার আর কিছু চাইবার নাই । খুব  ইচ্ছে হছে মিতুর পাশে গিয়ে বলি , এক কাপ চা করে দাও চিনি দুই চামচ না , তিন চামচ দিবা । আমি ডায়াবেটিস এঁর রুগি না যে বেশি চিনি খেতে পারব না ।  এটাই কি ভালবাসা, দুর্বার আবেগ

আমি কবিতা আবৃত্তি করছি ,

বিষাদে বিলীন হয় মন , আমি বিষাদের কেউ নই
আমি স্বপ্নের হাতছানি টেনে এনে মনে প্রিয় স্বপ্নে ভাসি
আমি তোমাকেই খুজি প্রিয় তোমাকেই খুজি
তোমার আকাশ প্রিয় আজ দেয় হাতছানি

সেইদিন সন্ধ্যা বেলা আমার মোবাইলে মিতুর ফোন থেকে ফোন আসে । মিতু বলে ,
- দীপ্ত ভাই , আপনি দুপুরে আমাকে ফোন দিয়েছিলেন । আপনি জানেন না এই সিম থেকে আমি শুধু আপনাকে ফোন দিয়েছিলাম । অপরিচিত নাম্বার থেকে ফোন দিলে কেউ কথা বলত । আপনি কথা বলেননি । চুপ করে আছেন কেন ।
- আসলে কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল । খুব ইচ্ছে হয়েছিল ।
-আমি বুঝতে পারছি , দীপ্ত ভাইয়া , আপনি বিভ্রমে ডুবে যাচ্ছেন । আপনার বিভ্রম দূর করা দরকার । আপনি কাল আমার সাথে একটু দেখা করবেন

মিতু ফোন রেখে দিল । আমি চুপ হয়ে বসে রইলাম ।

মিতুর মুখোমুখি আমি বসে আছি । মিতুকে একটা পরীর মতো লাগছে । আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে মিতু কে বলি , মিতু তোমার কপালের টিপ টা অনেক সুন্দর হয়েছে । আমি বলতে পারছি না । মিতু নিরবতা ভেঙ্গে বলল ,
- দীপ্ত ভাইয়া , আপনি বোধহয় আমার প্রেমে পড়ে গেছেন । ভয়াবহ রকমের প্রেমে । আপনি এঁর আগে কোন মেয়ের সাথে কথা বলেন নি দেখে আমার প্রতি আপনার এই তীব্রতা তৈরি হয়েছে । আমি আসলে আপনার মতো ছেলেকে পছন্দ করিনা । আপনাকে দেখার পর আমার মধ্যে একটা মোহ তৈরি হয়েছিল । আমি আপনার মতো একটা ভালো মানুষের সাথে দিব্যি সংসার পাতব । টুনটুনির সংসার হবে । কিন্তু আমি আসলে চাই একটা ছেলে যে চটপটে , সবসময় কথা বলবে , স্মার্ট ঠিক আমার মতো । আপনি আসলে আমার টাইপ না । আমি আপনার সাথে হ্যাপি হব না।
দেখতে সুন্দর হবে চেহারায় মায়া মায়া থাকবে । আপনার মতো না ।
মিতু কথা গুলো বলে চলে যায় । আমি আহত দৃষ্টি নিয়ে থাকিয়ে থাকি । মিতু কে দেখে যাই । খুব ইচ্ছে হয় মিতুকে একটা আইস ক্রিম কিনে দেই । বলা হয় না । মিতু চলে যায় ।
আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে । মিতুকে খুব সামনে থেকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে । সেদিন মিতু কে হয়ত বলতে পারিনি , আজ বলতে ইচ্ছে হচ্ছে , মিতু আমি হয়ত তোমার টাইপ না । কিন্তু তোমাকে ভালবাসতাম বিশ্বাসে , মিশিয়ে রাখতাম নিঃশ্বাসে , আমার যা ছিল সবটুকু নিংড়ে দিতাম তোমায় । যে আজকে তোমায় শুধু তোমার টাইপ দেখে ভালো বাসবে একদিন তার কাছে তোমার মূল্য কমে আসবে , সে আর মুগ্ধতা নিয়ে তোমার দিকে তাকাবে না ।

আমি বুক পকেটে বিশ টা প্যারাসিটামল নিয়ে এসেছিলাম । মিতুর মুখ আর বেশি করে ভাসছে । আমি মিতু কে ভালোবাসি মিতুর হাসি দেখতে চাই প্রতিনিয়ত । মিতু কে ভালোবাসছি , মিতুর হাসি মুখ দেখতে । আজ মিতু হাসছে। আমি হ্যাপি । আমি আমার স্বপ্ন গুলো পুরনের জন্য উঠে দাঁড়ালাম । একপাশে ছুড়ে দিলাম প্যারাসিটামল । হয়ত আমার একদিন মিতুর সাথে আমার দেখা হবে , বলব , মিতু আমি তোমাকে আজো ভালবাসি , আমি একটা আশ্রম দিয়েছি , যেখানে ২০ টা ছোট বাচ্চা কে আমি ভালবেসে বড় করছি । তারা যখন হাসে তখন আমি তোমার হাসির শব্দ শুনতে পাই ।

মিতু হয়ত এক মুহূর্তের জন্য ভাববে ইশ মানুষ টা আমাকে এখনো খুব ভালো বাসে । আমার মন আনন্দে ভরে যাবে ।

মনটা হঠাৎ করে ভালো হয়ে গেল । সন্ধ্যা নেমে আসল , সন্ধ্যা টা মিতুর হাসির মতো সুন্দর , আমি গুন গুন করে আবৃত্তি করছি ,

মনে হয়
দীর্ঘকাল বাক্সের মধ্যে বন্দী ছিলাম বলে প্রিয়তা তোর ঈর্ষার কাছে পরাজিত
আজ মনে হয় কচ্ছপ হই গায়ে খসখসে চামড়া নিয়ে
কোন এক বিলের পাশে গর্তে পড়ে থাকব অবলীলায়

প্রিয়তা আমি তোমায় নিয়ে স্বপ্ন দেখে যাব ৬০০ বছর
আমার স্বপ্নে তুমি ভিজবে না তবু প্রিয় তুমি যে আমার
( প্রিয়তা কানে কানে একটা গোপন কথা বলি , তোমার ঈর্ষার আগুনে আমি ঠিকই পুড়েছি ,কেবল তুমি টের পাওনি)

উৎসর্গ- আমার বর্ষাকে যার মুখের একটি শব্দ শুনার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি ।
বি- দঃ – প্রায় সময় দেখি প্রিয় মানুষ টা ছেড়ে চলে সবাই সুইসাইড এঁর কথা ভাবে – একটা ব্যাপার কি জানেন যে আপনাকে ছেড়ে অন্য জায়গা নিজেকে সুখী মনে করে তাকে থাকতে দিন । আপনি তাকে আর সুখী করতে পারবেন না । আপনি আপনার চারপাশের মানুষ কে আনন্দ দিন আর এই মানুষ টার সুখ কামনা করুন । কারন আপনি তো চান সে সুখী হউক ।

মন্তব্য থেকে
*আজিম হোসেন আকাশঃ বেশ ভাল লাগল।*
*আমির হোসেনঃ আপনাকে চলন্তিকার নতুন ভুবনে স্বাগতম। প্রথম গল্প প্রথম লেখা ভাল লাগল। নিয়মিত লেখার চেষ্টা করুন।*
*আরিফুর রহমানঃ গল্পটি অসাধারণ লেগেছে। চালিয়ে যান।*

ছড়া

## আজ বাড়ী যাচ্ছি

রফিক আল জায়েদ ✍ *আমি বিখ্যাত কোন লেখক নই। সখের বশে কিবোর্ড স্পর্শ করি। আর সখের বশে কখনও লেখক, কবি, গল্পকার, কখনও আরও অনেক কিছু..... প্রিয় ব্যাক্তিত্ব(.সা) হযরত মুহাম্মাদ : যাদের লেখা ভাল লাগে কবিমুহিব খান : লেখকতামীম রায়হান :, সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর, ভালবাসি মা মাটি ও মানুষকে....*

আজকে আমি বাড়ী যাব পাশে নেইত কেউ
দু'হাত দিয়ে বৃষ্টি ছোঁব, ছোঁব নদীর ঢেউ।
আমার দু'পা ভিজবে আজি যমুনা নদীর তীরে
সন্ধ্যা হলে আসব ফিরে আমার আপন নীড়ে।
আস যদি দেখতে আমায় ধলেশ্বরীর পাড়ে
টাঙ্গাইলের চমচম দিব আদর করে তাঁরে।
আসলে আমায় বন্ধু ভেবে আমার ছোট্ট বাড়ী
সাড়া গায়ে জড়িয়ে দেব টাঙ্গাইলের শাড়ী।

মন্তব্য থেকে
*আজিম হোসেন আকাশঃ ভাল লাগল।*
*আমির হোসেনঃ অপূর্ব ছন্দের মিল। ভাল লাগল।*
*আরিফুর রহমানঃ অপূর্ব ছন্দের মিল । ভাল লেগেছে। ধন্যবাদ।*

গল্প

## তিনি এবং একটি দুঃস্বপ্ন

মোঃ মাসুদ ফেরদৌস

তিনি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। ইদানিং আলো তার অসহ্য লাগে। চোখে আলো গেলে চোখ কটমট করে এবং চোখ থেকে অনবরত পানি পড়তে থাকে। বিষয়টা নিয়ে তিনি ডাক্তারের সাথে দেখা করেছেন। ডাক্তারের প্রেসক্রাইব করা ও ষুধও খাচ্ছেন নিয়মিত। তবে সমস্যার কোন সমাধান হচ্ছে না। তার ধারনা সমস্যা আরো বাড়ছে। তার চোখ থেকে এখন পানি পড়ছে। দেখে মনে হতে পারে তিনি কাঁদছেন।
তিনি বসেছেন বারান্দায় পাতা রকিং চেয়ারে। চেয়ারের হাতলের ওপর একটা নীল রংয়ের টাওয়েল রাখা। তিনি টাওয়েলটা হাতে নিয়ে চোখ মুছলেন।
আলো অসহ্যবোধ হওয়ায় তিনি খানিকটা লজ্জিত এবং বিষন্ন বোধ করছেন। মানুষ অন্ধকারের চেয়ে আলো পছন্দ করে বেশি। প্রাচীন কালে আদি মানবেরা রাতের অন্ধকারে আগুন জ্বালিয়ে আগুনকে ঘিড়ে বসে থাকত। মানুষ বিপদে পড়লে আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। আলো তাদের মনে খানিকটা হলেও আশার সঞ্চার করতে পারে। আর আলো কি না তার অসহ্য লাগছে!
অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি ঘোড়ের মধ্যে চলে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন একটি কুয়াশাঘেড়া বিরান ভূমি থেকে কি যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। গাঢ় কুয়াশা সত্বেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে একটি শিশু হামাগুড়ি দিতে দিতে সামনে আসছে। হঠাত্ কুয়াশা বিলীন হয়ে গেল। কুয়াশার পরিবর্তে ঠাই নিল অপরূপ জোছনা। রূপালী জোছনা গায়ে মাখতে মাখতে শিশুটি আসছে। শিশুটি অবিকল বাবুর মত করছে। কিছুক্ষণ হামাগুড়ি দিয়ে সোজা হয়ে বসে থাকে। তারপর চারপাশ দেখে আবার হামাগুড়ি দেয়। শিশুটি দেখতেও বাবুর মত। তিনি এবার কাঁপতে লাগলেন। তার হাত পা সবই কাঁপছে।
শিশুটি বসে আছে। তার দিকে তাকিয়েসে খুব মধুর ভঙ্গিতে হাসি দিল। যেমন হাসি কেবল শিশুরা তাদের বাবার দিকে তাকিয়ে হেসে থাকে। এবার তিনি আঁতকে উঠলেন। শিশুটির হাসি ও বাবুর হাসির মত। তিনি ছটফট করছেন । শিশুটি তার একেবারে কাছে এসে পড়লো। এইতো সে বসে তারদিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। যেন কোলে উঠতে চাচ্ছে।
তিনি বিকট এক চিত্কার দিয়ে উঠলেন।
রাহেলা বেগম রাহা ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন। তিনি শফিক সাহেবের গায়ে হাত রেখে বললেন,
'এই তোমার কি হয়েছে ?তুমি এমন করছো কেন ?'
শফিক সাহেব কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যালকরে তাকিয়ে থেকে বললেন,
'কিছু হয়নি ।এক গ্লাস পানি দিতে পারবে রাহা ?'
-তুমি উঠে বস ।আমি পানি দিচ্ছি।
রাহেলা বেগম রাহা টেবিলের ওপর রাখা ল্যাম্পটা জ্বাললেন। তারপর এক গ্লাস পানি এনে শফিক সাহেবের কাছে গেলেন। শফিক সাহেব যন্ত্রের মত হাতে গ্লাসটা নিলেন। পানিতে এক চুমুক দিয়ে গ্লাসটা রেখে দিলেন। তার হাত পা এখনও কাঁপছে।
-এই তুমি কি দুঃস্বপ্ন দেখেছো ? ভয় করছে ?

-কই না তো।
-তাহলে এরকম করছো কেন ?
-
আর করবো না। রাহা এক কাজ করতো। ল্যাম্পটা নিভিয়ে দাও। চোখে আলো লাগছে।
রাহেলা বেগম রাহা হাত বাড়িয়ে ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিলেন। তারপর শফিক সাহেবকে বললেন ,
'এদিকে আসো তো। তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।'
শফিক সাহেব বাধ্য ছেলের মত কাছে এগিয়ে গেলেন। রাহেলা বেগম রাহা তার মাথায় পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তিনি চোখ বন্ধ করলেন। এবং প্রায় সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যেও তিনি তার মাথায় হাতের পরশ টের পেলেন । তিনি আরো গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাত্ তিনি শিউরে উঠলেন।ওই তো অন্ধকারের দিখে মুখ করে থাকা লোকটাকে দেখা যাচ্ছে।. . . .

ইচ্ছেকথা

## যা পারিনি আমি...

শওকত আলী বেনু

ভাবছি আবারও বুঝি নালিশ! কী হয়েছে তোমাদের? তাও এত্তো রাতে।রাত তখন বারোটা।
ছেলে-মেয়ে দুটোর বাগ যুদ্ধের নালিশ দিনে কয়েক বার সামলাইতে হয় ।সেই থেকেই এই ভাবনা টুকু।ওরা দুজনই মুচকি হাসলো।বল্লাম,কী ব্যাপার! মনে হলো কোনো নালিশ নয়।

দুজনেই হাসলো। হেসে উত্তর দিল, হ্যাপি বাবা দিবস।সাথে কিছু উপহার!
কান্নাটা বুকের ভিতরেই আটকিয়ে রাখলাম।

আমিও আমার বাবাকে ভালবাসি।ভীষণ ভালবাসি।একটি কথা এখনো খুব মনে পরে।সেই ছোট্ট বেলার কথা।বাবা সপ্তা শেষে প্রতি বুধবার বাড়ি ফিরতেন।অপেক্ষায় থাকতাম কখন আসবে।দেখা মাত্রই ছুটে যেতাম।বড় আকর্ষণ বাবার হাতের ব্যাগটা।আগে ব্যাগটা হাতে নিতাম।সেই কী আনন্দ!

কিন্তু বলতে পারিনি কখনও।সেই একটি মাত্র কথা।বাবা তোমায় ভালবাসি।জানিনা, আর কোনো দিন পারবো কী?

তবু,মনে মনে বলি,বাবা তোমাকে ভালবাসি,ভীষণ ভালবাসি।অন্তত আজকের এই দিনে।

পৃথিবীর সকল বাবাকে আমার সালাম ও ভালোবাসা।

গল্প

## ঘর

সাফাত মোসাফি ๗ *আমি খুবই সাধারণ একটা ছেলে।সব সময় সাধারণ থাকার চেষ্টা করি।হালকা লেখালেখির অভ্যাস আছে,তাইতো ব্লগে আসা।কেমন লিখি জানিনা,তবে আমার লেখা পড়ে যদি আপনাদের ভাল লাগে তবেই আমার লেখার সার্থকতা।সেই সাথে হয়তো পরবর্তী কোন পোস্ট দিতে উৎসাহিত হবো।*

নদীর পার ঘেঁষে কাশবন।আর সেই কাশবনের বুক চিরে চলে গেছে একটা মেঠোপথ।জায়গা খুব সুন্দর।বিকেল বেলা জায়গাটা আরও বেশি সুন্দর লাগে।সেই জন্যই মনে হয় বিকেল বেলা অবসর কাটাতে কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকারা একান্তে কিছু সময় কাটাতে এখানে ভিড় করে।নদীর তীরের মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস কাশবনে দোলা দেবার আগে বোধহয় এইসব প্রেমিক-প্রেমিকার মনে দোলা দিয়ে যায়।তাই প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে এই জায়গাটার গুরুত্ব মনে হয় একটু বেশি।এখানে না এলে মনে হয় প্রেম ঠিক জমে ওঠেনা।।

তেমনি ভাবে এই জায়গাটা ছোট বেলা থেকেই অনেক প্রিয় ছিল তমাল ও মাহির। ছোট বেলা যখন তমাল ও মাহি এখানে আসত তখন তারা ছিল বন্ধু ও মামাতো-ফুপাতো

ভাই বোন।কিন্তু ছোট বেলার সেই বন্ধুত্ব একসময় পরিনত হয় ভালোবাসায়।কিন্তু তমাল মাহির ফুপাতো ভাই হওয়ায় ও ছোট বেলা থেকে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকায় তাদের এ সম্পর্কের ব্যাপারে কেউ আঁচ করতে পারেনি।তমালরা শহরে থাকতো।তাই নানা বাড়ি বেড়াতে এলে তমাল ও মাহি তাদের একান্ত সময় গুলো কাটাতে নদীর ধারে এই জায়গাটায় আসে।কারন এখানে তাদের কেউ বিরক্ত করেনা।রাড়িতে কি প্রেম জমে নাকি?সবাই বিরক্ত করে।প্রেম করতে হয় গোপনে।।তাইতো তাদের এখানে আসা.....

তমাল-মাহি পাশাপাশি বসে থাকে।দুজন দুজনার হাত ধরে বসে থাকে।মাহি  তমালের কাঁধে মাথা রাখে।তমালের কাঁধে মাথা রেখে মাহি নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে।আকাশ দেখে।তমাল পাশে থাকলে মাহির সব কিছু ভাল লাগে।তাই আজ মাহির সব কিছু ভাল লাগছে।এমনিতেও আজকের বিকেলটা খুব সুন্দর।।

ভালোবাসার নানা কথা,নানা রকম খুনসুটিতে মেতে ওঠে তমাল-মাহি।নদীর বুকে ডানা মেলে পাখির ঝাঁক উড়ে বেড়ায়।তাই দেখে তমাল মাহিকে বলে, -আকাশে পাখি হবে?
মাহি বলে, -হবো।
তমাল বলে, -চলো পাখির মত উড়ে চলি,হারিয়ে যাই আমাদের ভালোবাসার রাজত্বে।
মাহি বলে, -চলো.....

কল্পনায় পাখি হয়ে তমাল-মাহি ডানা মেলে উড়ে বেয়ায় আকাশে,হারিয়ে যায় তাদের ভালোবাসার রঙ্গিন রাজত্বে।।

নদীর দুষ্ট বাতাস যেন তাদের ভালোবাসা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়।তাইতো শিষ দিতে দিতে চলে যায় দুষ্ট বাতাস।নদীর ঢেউ যেন তাদের ভালোবাসার উত্থান-পতন।কখনো ভাললাগা কখনো বা খনিকের জগড়া।পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকা,পানি ছিটাছিটি,এসব যেন ভালোবাসা আরও বাড়িয়ে দেয়।এভাবেই একপা দুপা করে চলতে থাকে তমাল-মাহির ভালোবাসা।।

দুটি হৃদয় স্বপ্ন দেখতে থাকে ভালোবেসে ঘর বাধার।যে ঘরে থাকবে তমাল-মাহি,আর ঘর জুড়ে থাকবে শুধুই তাদের ভালোবাসা।

মন্তব্য থেকে
*আহমেদ ইশতিয়াক: এক্সিলেন্ট ... দাদা... ক্যারি অন। দিনকে দিন ভালো হচ্ছে খুব।*
*আমির হোসেনঃ ভাইয়া গল্পটাতো ভাল হয়েছে। লিখুন বেশী বেশী।*
*আরিফুর রহমানঃ গল্পটা খুব সুন্দর ভাল লাগল।*
*এ হুসাইন মিন্টুঃ অবশেষে ঘর কি বাধে ? নিরেট প্রেমের গল্প ভালোই লাগল*
*আহমেদ ফয়েজঃ গল্পটা লেখতে গিয়ে কি স্থানের কথা চিন্তা করেছেন ভাই? আমার মনে হচ্ছে আপনার গল্পটা আরো বড় হতে পারতো। এখানে আরো কিছু চরিত্র আসতে পারতো সচল ভাবে। মাহি ও তমাল ভালোবাসতে বাসতে আরো অনেক উড়াউড়ি করতে পারতো। ছোট গল্প বা অনুগল্পের যে চাহিদাগুলো এই গল্প তা পূরণ করতে পারে নি। তবে প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ। এই গল্পটিই আপনি আবার লিখুন দেখবেন সম্পূর্ণ হবে।*
*কাউছার আলমঃ গল্পটা ভাল লাগল।*
*আরিফুর রহমানঃ গল্পটি আবার পড়লাম ভাল লাগল।*

ছড়া

## নেশাখোর চোর

শহীদুল ইসলাম প্রামানিক

দিন দুপুরে হাবুল মিয়ার
উঠল ভীষণ নেশা
ফারাম গেটে করল চুরি
ছিল না তার পেশা।এসপি সাবের হাত ঘড়িতে
যেই না দিল থাবা
পুলিশ ধরে পিটন দিতেই
বলছে বাবা! বাবা!!

পিটন খেয়ে বলছে হাবু,
'পা ধরে স্যার কই,
নেশায় পরে করছি এসব
আমি তো চোর নই'।

'উঠলে নেশা হুস থাকে না
তাই তো করি চুরি,
ধরা পরলে সবাই পিটায়
সাথে লাথি গুড়ি'।

'গাঁজার নেশায় অন্ধ আমি
যতই পিটান স্যার
এক পুড়িয়া গাঞ্জা দিবেন,
জীবন বাঁচেনা আর'।

মন্তব্য থেকে
*আরিফুর রহমান: আপনাকে চলন্তিকাতে স্বাগত জানাচ্ছি। নিয়মিত লিখবেন। খুব ভাল লাগল।*
*সপ্নিল রায়: ছড়াকার ভাইকে স্বাগতম ।*
*আহমেদ ইশতিয়াক: ভাই... প্রথম আলো ব্লগে আপনার লেখা নিয়মিত পড়তাম। আশা করি আপনি চলন্তিকাতে নিয়মিত লিখবেন। চলন্তিকাতে আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আর আপনার ছড়াটি পড়ে মজা পেয়েছি। আরও ভালো লিখুন। শুভকামনা ... :)*
*এ হুসাইন মিন্টু: চলন্তিকায় আপনাকে স্বগত, ছড়া অনেক ভালো হয়েছে*
*আমির হোসেন: প্রথম লেখাতেই বাজিমাত করে নিলেন। আমি আপানর ভক্ত হয়ে গেলাম।*

গল্প

## শশুর বাড়ির পিঠা

মোঃ ওবায়দুল ইসলাম

আমার বরাবর ই পিঠা পায়েস বিশেষ করে মিস্টান্ন খাবার খুব পছন্দ। কেউ মিষ্টির দাওয়াত দিলে মনে হয় শশুর বাড়ির দাওয়াত পাইছি।
মিষ্টান্ন আমার এতটাই প্রিয় !

এস,এস,সি পরিক্ষা দিয়ে ঢাকায় আসি , একটা কাজ পেয়ে গেলাম চিঠি বিলির কাজ ;রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে। বাড়ি গেলেই পিঠা । মা ও বানাত, মাকে আমি ই সাহায্য কতাম। চাল ভাঙা কাজটি আমি করতাম। কাজটি মহিলাদের হলেও পিঠার লোভে ও কাজ টি আমি খুব ভাল করেই শিখে নিয়ে ছিলাম। ভাই বোন সবাই ছোট ছোট , ওরাও খুব পছন্দ করত।

আমি মা পিঠা বানাতাম , সবাই মিলে খেতাম।

দিন পার হল আমি এইচ, এস, সি দিলাম, বোনরা ও বড় হল, এখন ওরাই বানায় , মোবাইলের যুগ ঢাকা থেকে রওয়ানা হওয়ার আগেই আমি মাকে পিঠার রিকুইজেশন দিতাম, মাও তাই করত।

বাড়িতে যাওয়া মানে আমার আট দশ পদ পিঠা খাওয়া। খুব ভাল যাচ্ছে আমার দিন।

বোনদের বিয়ে দিতে লাগলাম, প্রথম বোন ,দিতীয় বোন , আমার পিঠা খাওয়াতেও কিছুটা ভাটা পড়ল। একে বারে যে বন্দ হল তা না, কিছুটা কম।

বিয়ে করলাম, মনে মনে এবার পিঠা খাওয়ার ধুম পরে যাবে। শশুর বাড়ির পিঠা মানে তো ————!

আমি খুব উদ্দীপনা নিয়ে যথা সময় শশুর বাড়ি হাজির পিঠা খাওয়ার লোভে। দিন গেল রাত গেল পিঠার দেখা নাই মেলে। যখনি বউ কিবা শালিকা বা শশুড়ি ডাক দেয় তখনই মনে হয় এই বুঝি পিঠা খাইতে ডাকল।

এক বেলা খুব আদর করে শাশুড়ি ডাকল , মনে মনে খুব আস্থাত হলাম পিঠাই এবার খাওয়াবে , আমি লুঙ্গি খানা একটু আগালা করে পড়লাম; বেশি খেতে হবে এই ভেবে, গিয়ে শুনি শাশুড়ি বলল -
"বাবা, তুমি নারকেল গাছে উঠতে পার ? "
আমি বললাম " না "
শালিকা " দুলা ভাই , তাহলে আপনি কি পারেন? "
" এ বিষয়ে এক টা পারি, এক টা পারি না "
" তা আবার কেমন?"
"আমি ঘরের গাছে উঠতে পারি, আর কেউ নারকেল কেটে নারকেলের পানি নিয়ে সাদলে না বলতে পারি না। "
শাশুড়ি আমাকে নিরাশ করে বলল "বাবা যাও। "

আমি যথা সময় বাড়ি ফিরে এলাম, ভাবলাম শশুর বাড়ির নেয়া ব্যাগ টা মনে হয় হালকা ছিল, তাই হয় তো তারা ভেবে দেখেছে পিঠা বানানোতে পোষাবেনা, তাই হয়ত বানায় নি।

এ বার আমার ২য় মিশন ।

শশুর বাড়ি রওয়ানা হলাম, যাওয়ার পথে ভাল মন্দ যা কিছু নিলাম। সাথে বড় করার জন্য মুড়ি আর ভাড়ি করার জন্য তরমুজ নিলাম, সব মিলিয়ে পাচ টি ব্যাগ ।
শশুর বাড়ি ঢুকলাম, শাশুড়ি সামনে ব্যাগ গুলো রাখলাম, মনে মনে বললাম -এবার পিঠা না খাওয়ায় কই যাবে!

এখন ঘুমের ভিতর ও দেখি, শাশুড়ি পিঠা খেতে ডাকে। জেগে দেখি নাই। ভাত তেমন একটা খাই না। কখন পিঠা নিয়ে আসবে , পেট ভরা থাকলে ত খেতে পারবনা, সেই চিন্তায়।

নাহ ! কোন লক্ষন নাই।

এবার উপ মিশন ।
মাকে দেখতাম, কোন দিন সকালে ভাত খেতে না পারলে বা ভাত না থাকলে পিঠা বানাত।
সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ নিয়ে খাবারের কক্ষ হয়ে বাইরে নামছি, ব্রাশ দিয়ে ভাতের পাতিলে একটা নাড়া দিলাম।
শাশুড়ি পাশের কক্ষ থেকে বলল, কিসের শব্দ?
আমি বললাম , "আম্মা ভাতের ভেতর বড় বড় দুই টা ইদুর পড়েছে। "
"আহা, ভাত আর খাওয়া যাবেনা !"
ভাবলাম,এবার !
মনপুলোকিত ! মনের সুখে খেতে বসলাম।
এবার আমি আশাহত হলাম।

যথা সময় পিঠা খাওয়া মিশন ব্যথ,

বাড়িতে ফিরে এলাম ।

মাকে বলে কয়ে পিঠা বানানো কাজে রাজি করালাম। বাড়িতে মা একা থাকার কারনে বউকে চাল বানার কাজে মাকে সাহায্য করতে হয়।

পিঠা হল।
খুব আমুদে খাচ্ছি। মনে মনে বলছি, দেখ, শাশুড়ি পিঠা কেমনে খাচ্ছি।
খেলাম ।
সমস্যা হল অন্য যায়গায়, যখন শুতে গেলাম ,বউ হাত দেখাল, পা দেখাল, কাধ দেখাল, পিঠা বানাতে তার কত দকল গেছে!
আমার চোখে বৃষ্টি হল!
তখন বুঝলাম আগের দিন নাই , এখন পিঠাতে অনেক কষ্ট। চাল অনেক শক্ত হয়ে গেছে সাথে মিঠাও ।

আমার পিঠা খাওয়ার সাধ মিটল চির তরে।

মন্তব্য থেকে
*সপ্নিল রায়ঃ ভাই পিঠা খাইতে মন চায় ।*
*আরিফুর রহমানঃ পিঠা খেতে আমার খুব ভাল লাগে। এখন পিঠার গল্প পড়লাম খুব ভাল লাগল।*

কবিতা

## ভালবাসাবাসি

আহমেদ ফয়েজ ✍ *লেখালেখির জন্য কাজ করি। পড়ি। লিখি। লেখা হয় কিনা জানি না। কাজ করছি একটি এনজিওতে। এছাড়া পাক্ষিক সময়ের বিবর্তন'র সহকারি সম্পাদক হিসেবে কাজ করছি প্রায় ১০ বছর ধরে।*

ভালবাসা হলো
আকাশপানে দৃষ্টি মেলে, নীলে
নীল হওয়া।

ভালবাসা হলো
কিছু ডানা
ডানায় ডানায়
এলোমেলো উড়ে চলা।
কথা বলা।

ভালবাসা হলো
নি:শ্বাস মেলে
প্রজাপতির রঙ্গে বিলীন হাওয়া
গন্ধ পাওয়া।

ভালবাসা হলো
চোখে চোখ
ঠোটের কোনে একচিমটি হাসি
ভালবাসাবাসি।

মন্তব্য থেকে
*সাফাত মোসাফি: সুন্দর।*
*মোঃ ওবায়দুল ইসলাম: ভালো লাগল।*
*শ্যাম পুলক: কবিতা ভাল লাগল। ভালবাসা যে কত বেশি কিছু বলে শেষ করা যাবে না। আপনার বর্ণানা সুন্দর হয়েছে। শুভেচ্ছা রইল।*
*আমির হোসেন: ভালবাসার কোন সীমা নেই। ভাল লাগল কবিতাটি।*
*এ হুসাইন মিন্টু: ভালোবাসার অনেক সজ্ঞা দিয়েছেন, আরো আছে কি ?*
*আরিফুর রহমান: সংজ্ঞা গুলো ভালই লাগল।*

অণুকাব্য

## বৃষ্টি নিয়ে অণুকাব্য

অংকুর

(১)
হাত ভিজিয়ে ছুঁইনা বৃষ্টি
মন
বাড়িয়ে
ছুঁই
আকাশের কান্না দেখে
অবাক
তাকিয়ে
রই।।

(২)
এই মেঘ এই রোদ্দুরে
বৃষ্টি
ভিজিয়েছে
তোমায়
নাকি
তুমি
ভিজালে
বৃষ্টিকে!
অপরূপা বলি কাকে
বৃষ্টি
না
তোমাকে!

মন্তব্য থেকে
*আরিফুর রহমান: খুব ভাল লাগল। আপনাকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা রইল। নিয়মিত লিখবেন।*
*কাউছার আলম: খুব ভাল লাগল। আপনাকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা রইল*

সাক্ষাৎকার

## হুমায়ুন আহমেদ এর প্রথম সাক্ষাৎকার

সংগ্রহে আনোয়ার জাহান ঐরি ๏ *হুমায়ূন আহমেদের প্রথম সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন শাকুর মজিদ। সেখান থেকে এটি তুলে ধরা হল।*

বিশাল কুশনে আধশোয়া শাকুর মজিদ বললেন, ১৯৮৬ সালে 'দিশা' হুমায়ূন আহমেদের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। এটিই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার। এখন কিভাবে লেখাটা পাওয়া যায় সেই এতদিনকার কথা। বললাম, তিনটা জায়গায় খুঁজে দেখতে পারেন। এক. ন্যাশনাল আর্কাইভস, দুই. জাতীয় গণগ্রন্থাগার এবং তিন. বাংলা একাডেমী। দেরি না করে ফোন করলাম মোবারক হোসেনকে; বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত। রাত সাড়ে এগারোটা প্রায়। ভয় ছিল, হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। না, ফোনটা ধরল এবং বিষয়টা বললাম। শাকুর এসেছিল আমার উপর তলায় হুমায়ূনের বাসার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের পাশে একদণ্ড থাকতে। ফেরার সময় আমার ঘরে আসা। তো তখনই হুমায়ূন প্রসঙ্গ উঠতে এই তথ্যটা বের হলো। পরদিন মোবারকের ফোন পাই। কণ্ঠস্বরে অস্থিরতা, হ্যাঁ পাওয়া গেছে। শুধু আমি নই, মোবারকও অবাক, এই পত্রিকা একাডেমীর লাইব্রেরিতে আছে! এমন কোনো বিখ্যাত পত্রিকা নয়, বেশি দিন প্রকাশিতও হয়নি, অনেকটা অগোচরেই এসেছে আবার চলেও গেছে। আর পূর্বসূরি কোনো এক লাইব্রেরিয়ান বাঁধাই করে রেখে দিয়েছেন আলমারির তাকে। তিনি কি জানতেন একদিন খোঁজ পড়বে! সাক্ষাৎকারে অপেক্ষা করছে এ সময়ের পাঠকদের জন্য বিস্ময় এবং কালজয়ী তথ্য। সচিত্র পাক্ষিক দিশার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বরে। সম্পাদক শামসুন্নাহার জ্যোৎস্না ১৪৯ সি ধানমণ্ডি, ১৩/২ রোড নং ঢাকা। জানা যায়, এই সচিত্র পাক্ষিক দিশার সর্বমোট ২০টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। হ্যান্ড কম্পোজে 'সুশ্রী' টাইপে পদ্মা প্রিন্টার্সে মুদ্রিত। আর হুমায়ূন আহমেদের সাক্ষাৎকারটি মুদ্রিত হয় ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ সালে প্রথমবর্ষ নবম

সংখ্যায়। সাক্ষাৎকারের ভেতরে ভেতরে ছাপা হয়েছে হুমায়ূন আহমেদের, তাঁর পরিবারের সদস্যদের আলোকচিত্র। তরতাজা মানুষটি ছবি হয়ে গেল- অথচ সাক্ষাৎকারের বিষয় বক্তব্য এখনো অনেকাংশে অটুট। শাকুর মজিদের এই সাক্ষাৎকারের ভেতর পর্যবেক্ষণযোগ্য কিছু তথ্য রয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে হুমায়ূন খুব একটা বদলাননি। সব কথা অকপট, খোলামেলা। এ সময়ের পাঠকদের জন্য রয়েছে কিছু প্রশ্নের উত্তর। তাঁর রচিত চরিত্রের নামকরণের জটিলতা, বিভিন্ন গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গ। আর সাক্ষাৎকারের শেষে শাকুর মজিদ লিখেছেন '...বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় (বর্তমানে) ঔপন্যাসিক...।' শাকুর মজিদ এর 'বর্তমান' কখনও বদলায়নি। আজও রয়ে গেছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এই 'বর্তমান' সব সময়ই বর্তমান থাকবে। এখানেই শেষ নয়। শাকুর মজিদ এরই ফাঁকে হুমায়ূন আহমেদের মায়েরও সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এই অংশটি পড়ে পাঠকের হৃদয় দুমড়ে-মুচড়ে হাহাকার করবে। 'তাঁর বাবা পাণ্ডুলিপিটা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন- এটা যত্ন করে রেখে দিস- তুই একদিন খুব নামকরা লেখক হবি।' আলমগীর রহমান, স্বত্বাধিকারী প্রতীক ও অবসর প্রকাশনা সংস্থা

হুমায়ুন ফরীদি অভিনীত নাটক 'নির্বাসন' দেখতে গিয়ে হুমায়ূন আহমেদ নামের একজন লেখকের সাথে যখন আমার প্রথম পরিচয় তখন আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র (১৯৮০)। পরে খোঁজ নিয়ে শুনলাম এ লেখকের আরো তিনটে উপন্যাস বেরিয়েছে লেখকশিবির পুরস্কার প্রাপ্ত 'নন্দিত নরকে', 'শঙ্খনীল কারাগার' আর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী 'তোমাদের জন্য ভালোবাসা'। সহজলভ্যতার সুবাদে বই তিনটি সাথে সাথে পড়ে নিতে আমার খুব একটা সময়ের প্রয়োজন হয়নি। এরপর ঈদ সংখ্যা কিংবা আর কোনো কাগজে বেশ কিছুদিন তাঁর কোনো লেখা পড়িনি। বন্ধুরা অনেকে বলত যে হুমায়ূন আহমেদ মারা গেছেন। নিজেও বিশ্বাস করেছি। এরপর হঠাৎ একদিন টেলিভিশনেই সম্ভবত 'প্রথম প্রহরে' শিরোনামে হুমায়ূন আহমেদের একটা নাটক দেখলাম- কিন্তু তখনও সংশয় কাটেনি। সন্দেহ ছিল নন্দিত নরকেরই সেই হুমায়ূন আহমেদ, নাকি অন্য কেউ? এরপর অবশ্য ঈদ সংখ্যাগুলো খুলতেই চোখে পড়ত আমার অনেক দিনের কাঙ্ক্ষিত সেই ঔপন্যাসিকের নাম- দীর্ঘ সাত বছর পলিমার রসায়নে পিএইচডি নিয়েও যিনি নিজেকে আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের এক অভিনব আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন, যেটা কেবল তাঁর একারই। আর প্রকাশকদের অহর্নিশ চাহিদা আর পাঠক-পাঠিকার নিরঙ্কুশ ভালো লাগাই যদি জনপ্রিয়তার মাপকাঠি হয় তবে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ।

দিশার পক্ষ থেকে গত ২১ জানুয়ারির পড়ন্ত বিকেলে গিয়েছিলাম আমি আর বাবু তাঁর আজিমপুরের বাসভবনে। ছিমছাম মধ্যবিত্তের সাজানো-গোছানো ড্রইংরুম। মেঝের উপর জল রং করছেন তাঁর ছোট বোন। স্বাগত জানালেন কার্টুনিস্ট আহসান হাবীব (হুমায়ূন আহমেদের ছোট ভাই)। প্রসন্ন মুখে হুমায়ূন আহমেদ বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন- বলুন ভাই, কী করতে পারি?

বললাম- আপনার ব্যক্তিগত জীবন দিয়েই শুরু করি?

যেহেতু আগেই যোগাযোগ করে আগমনের উদ্দেশ্য নির্ধারিত ছিল।

- আপত্তি নেই।

তিনিই জানালেন, ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জে (মামার বাড়ি) তাঁর জন্ম। বাবা শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ (স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদ), মা আয়েশা আক্তার। তিন ভাই তিন বোনের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বড়। পুলিশ অফিসার বাবার সাথে ঘুরে ঘুরে ছোটবেলাতেই অনেক জায়গা ভ্রমণ করেছেন- অর্জন করেছেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সিলেটের মীরাবাজারের কিশোরীমোহন পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সেরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যথাক্রমে বগুড়া জিলা স্কুল ও ঢাকা কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হন। [তাঁর ছোট ভাই কার্টুনিস্ট আহসান হাবীবের কাছ থেকে জানলাম, মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি ১৯৬৫ সালে রাজশাহী বোর্ড থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন- এ কথা অবশ্য না লেখার অনুরোধ করেছিলেন।] উচ্চ মাধ্যমিক সেরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন রসায়ন বিভাগে। বিজ্ঞান প্রিয় বিষয় বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসসিতে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান (তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে জানা) পাওয়ার পর বেশ কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এরপর আমেরিকার নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পলিমার রসায়নে ডক্টরেট করে এসে (১৯৮২ সালে) এখন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত আছেন। জিজ্ঞেস করলাম- বিদেশে থেকে না গিয়ে দেশে ফিরলেন কেন?

- ফিরলাম, যাতে আপনাদের জন্য 'এই সব দিন রাত্রি' লিখতে পারি। না ফিরলে কে লিখত?

প্রসঙ্গ পাল্টে লেখালেখি সংক্রান্ত প্রশ্ন শুরু করলাম- লেখালেখির প্রতি অনুরাগ কখন থেকে?

- বানান করে করে প্রথম গল্পটি। যেদিন পড়লাম- মনে হয় সেদিন থেকেই। তবে সুদূরে শৈশবের স্মৃতি মনে নেই। আজকে বলছি।

- প্রথম লেখা কিভাবে ছাপা হলো?

- 'নন্দিত নরকে' লেখা খাতাটি বন্ধু আনিস যাবেত 'মুখপত্র' পত্রিকার সম্পাদককে দিয়ে এলেন। সেটা ছাপা হলো। প্রথম লেখা ছাপানোর পেছনে কোনো মজার গল্প নেই। এরপর আহমেদ ছফা প্রথম বইটির জন্য প্রকাশক জোগার করলেন। খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানী।

- দ্বিতীয়টা (শঙ্খনীল কারাগার)?

- প্রকাশক চেয়ে নেন।

- 'নন্দিত নরকে' আর 'শঙ্খনীল কারাগারে' পাত্র-পাত্রীদের নাম একই কেন?

- নতুন নাম খুঁজে পাইনি।

- ঐ দুটোর খোকা চরিত্রের সাথে লেখকের ব্যক্তিজীবনের কী সাদৃশ্য আছে?

- আমি বোধ হয় ওতো ভালো নই। তবে আমিও মাঝে মাঝে খোকার মতো হতে চাই। তা ছাড়া লেখকও খোকার মতো খানিকটা বোকা।

- এ দুটোর প্লট কী করে পেয়েছেন?

- মনে নেই। তবে আমি আগে কখনো প্লট ভেবে লিখতে বসি না।

হুমায়ূন আহমেদ জানালেন, কোনো কিছু লেখার আগে কোনো দিনই তিনি প্লট সাজিয়ে লিখতে বসেন না। লিখতে লিখতেই পাত্র-পাত্রীরা এসে যায়, চরিত্র সৃষ্টি হয়, কাহিনী গড়ায়। লেখার জন্য কোনো রকম পরিবেশ কিংবা 'মুড'-এর জন্য কোনো ধরনের উপকরণের প্রয়োজন হয় না। চাপের মুখে একটানা সাত-আট ঘণ্টা লেখার অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। তবে সাধারণত অবসর পেলেই লেখেন, আর পড়েন।

- নির্জনে লেখেন না?

- আমার একটা বড় বাড়ি হলে চেষ্টা করে দেখতাম।

- বড় বাড়ির জন্য ইচ্ছা হয় না?

- মাঝে মাঝে হয়।

হুমায়ূন আহমেদের গল্পের পাত্র-পাত্রীরা মধ্যবিত্ত পরিবারের। তাঁর মতে, মধ্যবিত্তদেরকেই তো ভালো করে দেখেছি। সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতায়- এর বাইরে লিখব কিভাবে?

- কেন? উচ্চবিত্ত পরিবারের প্লটেও কিছু কিছু তো লিখলেন- যেমন 'একা একা'?

কিছু উচ্চবিত্তদেরও দেখেছি।

- গল্প, উপন্যাস ছেড়ে নাটক লিখতে এলেন কখন?

- ১৯৭৪ সনে 'নন্দিত নরকে' উপন্যাসটিকে মঞ্চনাটকে রূপ দিই। রেডিওর জন্য 'শঙ্খনীল কারাগার'-এর বেতার নাট্যরূপ দিই ১৯৭৫-এ। টিভির জন্য প্রথম নাটক লিখি 'প্রথম প্রহর' ১৯৮০ সনে।

- কেন এলেন?

- টাকার জন্যে।

এরপর কথা হলো বাংলাদেশ টেলিভিশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটক 'এই সব দিন রাত্রি' নিয়ে। জানালেন যে মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের আগ্রহে এ সপ্তাহের একটি নাটককে বড় করে দেয়া হলো। সিরিজ নাটকে। দর্শক হিসেবেও তাঁর কাছে নাটকটি উপভোগ্য ছিল। তবে মাঝে মাঝে মনে হতো যে রকম চেয়েছিলেন, সে রকম হচ্ছে না।

- এরপর সিরিজ নাটক লেখার ইচ্ছা আছে?

- আর্থিক ঝামেলায় পড়লে হয়তো লিখব।

- সিনেমার জন্য কাহিনী লেখার ইচ্ছা আছে?

- যদি কেউ মুক্তিযুদ্ধের উপর ভালো ছবি করতে চায় তাহলে লিখব।

হুমায়ূন আহমেদের একটা বৈশিষ্ট্য (কিংবা দোষ) যে তার বেশির ভাগ কাহিনীতেই বিশেষ কয়েকটি নাম বার বার ঘুরে ঘুরে আসে। অথচ প্রতিটি চরিত্রই স্বতন্ত্র। এটা কেন হয়- জানতে চাইলেই সহজ উত্তর দেন, 'নতুন নাম খুঁজে পাই

না'। আমার বিশ্বাস হতে চায় না। মনে হয় কোনো একটা কিছুকে লুকোনোর জন্যই এগিয়ে যাওয়ার মতো উত্তর। পাশে বসা তাঁর স্ত্রী জানালেন, 'ও উপন্যাস লিখতে বসে আমাকে নাম জিজ্ঞেস করে। আমি সাথে সাথে বলতে না পারলে বলে- আমি তাহলে আগের নামটিই লিখি? এভাবেই একই নাম বার বার আসে- আসলে অন্য কিছু নয়।'

- আচ্ছা 'নীলু'কে আপনি চেনেন?

- না।

- এ নামটা কেন বার বার আপনার গল্পে-উপন্যাসে আসে?

- নামটা সুন্দর। [এ জায়গায় তাঁর স্ত্রী জানালেন, তাঁরা যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন পাশের বাসায় এক শ্রীলঙ্কান পরিবার থাকত- ঐ বাসায় একটি মেয়ের নাম ছিল নীলু। হুমায়ূন আহমেদ হাত দিয়ে দেখালেন- এতটুকু (চার-পাঁচ বছরের) মেয়ে]।

- নীলগঞ্জই বা কেন আসে?

- সম্ভবত নীল থেকে।

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর এমন অনেক উপন্যাসও লিখেছেন, যেগুলোর শিরোনামে গল্প বেরিয়েছিল অনেক আগে। অথচ উপন্যাসকেও যে গল্পের পরিবর্ধিত রূপ বলা যাবে, এমনও হয় না। তবে কেন? হুমায়ূন আহমেদের সেই একই জবাব- নতুন নাম খুঁজে পান না। তাঁর মতে, নাম দেয়ার জন্যেই দেয়া। [তাহলে কি নামকরণের সার্থকতার কথা তিনি কখনো ভাবেন না?]

- আচ্ছা, আপনি এত বেশি লেখার সময় কখনও আপনার লেখার মান সম্পর্কে সন্দিহান হন না?

- হ্যাঁ, আমি প্রচুর লিখি। আবার না লিখেও থাকতে পারি। প্রথম চারটি উপন্যাস প্রকাশের পর আমি সাত বছর কিছুই লিখিনি। আবার হয়তো একটা সময় আসবে যখন কিছুই লিখব না।

- একঘেয়ে ঠেকায় এক সময় যদি কেউ আপনার লেখা না পড়ে, তখন আপনি কী করবেন?

- কী আর করব? মন খারাপ করা ছাড়া কিছু করার আছে কি?

- আচ্ছা, আপনি লেখেন কেন?

- বলা মুশকিল, তবে লিখতে ভালো লাগে।

- অমরত্ব পাওয়ার বিন্দুমাত্র আশায়ও কি আপনি লেখেন?

- না। অমরত্ব মহাপুরুষদের জন্য। আমি মহাপুরুষ নই, সাধারণ মানুষ।

- আপনি কি নিজেকে কখনও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক বলে মনে করেন?

- যখন জানলাম আমার একই বইয়ের প্রথম মুদ্রণ এক মাসে বিক্রি হয়ে গেছে। [তবে এটা হালকা ধরনের ভৌতিক উপন্যাস, গর্ব করার মতো কোনো রচনা নয়।]

- নিজের কাছে আপনার পরিচয় একজন লেখক, নাকি শিক্ষক?

- লেখক।

- উপন্যাসের শিরোনামে রবীন্দ্র-জীবনানন্দ থেকে ধার করেন কেন?

- এঁদের কাছ থেকে ধার করতে আমার লজ্জা লাগে না বলেই।

- যদি বলা হয় 'তোমাকে' প্রেমের উপন্যাস [কভারে লেখা আছে] হিসেবে সার্থক নয়- আপনি কী বলবেন?

- কিছু বলব না।

- আচ্ছা, একটু অন্য ধরনের প্রশ্ন- 'প্রেম' ছাড়া ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্ব হতে পারে?

- পারবে না কেন?

- দুটো ছেলে আর দুটো মেয়ের মধ্যে যে রকম বন্ধুত্ব হয়- একটা ছেলে আর একটা মেয়ের মধ্যেও কি একই রকম বন্ধুত্ব হতে পারে?

- তা অবশ্য নয়, কারণ এখানে ফ্রয়েডীয় কিছু ব্যাপারস্যাপার আছে।

- তাহলে যে বললেন...

- আসলে ব্যাপারটা একটু জটিল। আপনি অন্য প্রশ্ন করুন।

- আপনার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা কোনটা?

- তিনটে উপন্যাস লিখে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পাওয়াটা আমার কাছে একটা স্মরণীয় ঘটনা। না, না, এটা লিখবেন না, তাহলে লোকজন মনে করতে পারে আমার গর্ব হচ্ছে- লিখুন গুলতেকিন (স্ত্রী)-এর সঙ্গে পরিচয়।

- দুঃখজনক ঘটনা?

- বাবার মৃত্যু।

এরপর কিছুক্ষণ আপ্যায়ন পর্ব সেরে আবার শুরু হলো। সাহিত্যবিষয়ক কিছু কথাবার্তা শুরু হলো।

- বাংলা সাহিত্যে কার কার লেখা আপনার প্রিয়?

- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর, বিমল কর, সতীনাথ ভাঁদুড়ি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

- শংকরকে কেমন লাগে?

- ভালো। ওঁর প্রথম দিকের কিছু উপন্যাস খুবই ভালো।

- বাংলা সাহিত্য ছাড়া বিদেশি কোনো সাহিত্য পড়েন কি? প্রিয় কে?

- এক সময় প্রচুর পড়েছি। এখনো পড়ি। প্রিয় হচ্ছেন- জন স্টেইন-বেক। রেমাক।

- বড় গল্প আর উপন্যাসের মধ্যে একটু অন্য রকম প্রশ্ন করলাম- আপনার মতে, পার্থক্য কোথায়?

- জানি না।

- 'শঙ্খনীল কারাগার'-এর মুখবন্ধে 'নন্দিত নরকে' 'গল্প' বলে উল্লেখ করলেন- অথচ এটা 'উপন্যাস' হিসেবে বিবেচিত এবং পুরস্কৃত- তাহলে 'গল্প' বলেন কেন?

- আমাকে এসব জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। এ জাতীয় প্রশ্ন করা উচিত সাহিত্যের ছাত্রকে। আমি একবার একটি বইয়ের সমালোচনা লিখেছিলাম 'রোববার' পত্রিকায়। পরে সবাই সেটাকে গল্প বলতে লাগল এবং আমিও আমার গল্পগ্রন্থে (আনন্দ বেদনার কাব্য) ঢুকিয়ে দিলাম।

- আপনাকে যদি উপন্যাসের সংজ্ঞা দিতে বলা হয় তাহলে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন?

- কোনোভাবেই করব না। আমি যদি জানতাম উপন্যাস কী, তাহলে তো নিজেই লিখতাম, যা লিখেছি তার কোনোটিই কি সত্যিকার অর্থে উপন্যাস হয়েছে?

- ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লেখার কোনো পরিকল্পনা আছে?

- হ্যাঁ, মুক্তিযুদ্ধের উপর বৃহৎ ক্যানভাসে একটা উপন্যাস লিখব- এবং এ জন্য আমি পড়াশোনাও করছি।

- বঙ্কিম, শরৎ থেকে বর্তমান কালের উপন্যাসগুলোর ধারা অনেকখানি পরিবর্তিত- এর কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

- সময়ের প্রভাব। উপন্যাস তো সময়েরই ছবি। সময় বদলালে উপন্যাস বদলাবে।

- উপন্যাস সৃষ্টিতে বাস্তব অভিজ্ঞতা কতটুকু প্রয়োজনীয় বলে আপনি মনে করেন?

- অনেকখানি।

- একটা সার্থক উপন্যাসে কী কী গুণাবলি থাকা আবশ্যক?

- একটা সার্থক উপন্যাসে সমাজ ও কাল উঠে আসবে। লেখক একটি দর্শন দিতে চেষ্টা করবেন। উপন্যাস মানে তো শুধু গল্প নয়। গল্পের বাইরেও কিছু।

- সুন্দর গল্পের জন্য সুন্দর কাহিনীই কি অত্যাবশ্যকীয়?

- না।

- আচ্ছা, সাহিত্য দিয়ে সমাজসংস্কার কিভাবে করা যায়?

- জানি না। আমি নিজে সমাজসংস্কারের কথা ভেবে কিছু লিখি না।

- যখন লেখেন, তখন আপনি কোন শ্রেণীর পাঠকের কথা বিবেচনা করেন?

- সায়েন্স ফিকশনগুলি কম বয়েসী পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে লেখা। অন্যসব যখন লিখি তখন কোন শ্রেণীর পাঠকদের জন্য লিখছি তা মনে থাকে না। যাদের ইচ্ছা হয় পড়বে।

- আপনার লেখায় রাজনৈতিক কোনো বক্তব্য দেখা যায় না কেন?

- এখন থেকে দেখতে পারবেন।

- তার মানে রাজনীতি আসবে?

- হু।

মাথা নাড়েন হুমায়ূন আহমেদ।

- এটা কী ধরনের হতে পারে?

- আগেভাগে কিছু বলতে চাই না।

- এত দিন না আসার কারণ?

- এত দিন আমার ঝোঁক ছিল গল্প বলার দিকে। যে সমাজ, যে কাল এই গল্প তৈরি করেছে, তাকে অবহেলা করেছি। মনে হয়েছে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখই সব।

- আপনি কি মনে করেন যে প্রতিটি মানুষেরই রাজনীতি করা উচিত?

- অফ কোর্স। ইটস এ পার্ট অব আওয়ার লাইফ।

- ব্যক্তিগতভাবে আপনি কোন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী?

- আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, প্রতিটি মানুষের অধিকার সমান।

ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ বিষয়ক কথাও হলো কিছুটা।

- বাংলাদেশের তরুণ লেখকদের মধ্যে কে আপনার প্রিয়?

- ইমদাদুল হক মিলন, মঞ্জু সরকার।

- প্রিয় ঔপন্যাসিক?

- সৈয়দ হক। শওকত ওসমান। শওকত আলী।

- কবি?

- শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ।

- নাট্যকার?

- হুমায়ূন আহমেদ।

- কবিতা?

- জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগে একদিন'।

- নাটক?

- নৃপতি (নিজের লেখা- ফেব্রুয়ারিতে প্রথম মঞ্চস্থ হবে)।

- 'বাবা' আপনার উপন্যাসে আসেনি?

- 'বাবা' আমার গল্প-উপন্যাসে অনেকবার, অনেকভাবে এসেছেন (শঙ্খনীল কারাগার)।

- সে হিসাবে মা কিন্তু কম আসেন...

- সম্ভবত আপনার কথা সত্যি নয়।

সব শেষে আহমেদকে প্রশ্ন করেছিলাম, নতুন লেখকদের জন্য আপনি কিছু বলুন।

- নতুন লেখকদের জন্য আমার একটাই কথা- পড়তে হবে, প্রচুর পড়তে হবে- সব লেখকের লেখা পড়তে হবে। তাতে ভাষার ওপর দখল আসবে- কোন লেখক কিভাবে চরিত্রগুলো নিয়ে 'ট্রিট' করছেন, সেটাও পরিষ্কার হবে। আবার চোখ-কানও খোলা রাখা দরকার। যেমন কোন পেশার লোক কিভাবে কথা বলে, কিভাবে হাঁটে-চলে এসবও দেখতে হবে। তা ছাড়া কবিতা পড়া থাকলে বোধ হয় ভাষার প্রতি দখলটা তাড়াতাড়ি আসে।

আমরা হুমায়ূন আহমেদকে ছেড়ে তাঁর মার সাথে কথা বলতে চাইলাম। মাকে পাঠিয়ে নিজে ভেতরে গেলেন। বেশ বর্ষিয়সী মহিলা, স্বাস্থ্যবান। সাদা কাপড়ের লাল ডোরার শাড়ি পড়ে আমাদের পাশে এসে বসেন। গল্প শুরু করলাম মিসেস আয়েশা আক্তারের সাথে।

- আপনার ছেলেমেয়েরা কে কী করেন?

- বড় ছেলে হুমায়ূন আহমেদ। মেজ ছেলে জাফর ইকবাল- আমেরিকায় পোস্ট ডক্টরেট করছে, সে বাচ্চাদের জন্য লেখে, তিনটা বই বেরিয়েছে। ছোট আহসান হাবীব- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোলে এমএসসি পাস করেছে এবার। সে আবার ভালো কার্টুন আঁকে- উন্মাদ না কি যে কার্টুন পত্রিকা- এটার সহকারী সম্পাদক সে। বড় মেয়ে সুফিয়া হায়দার- পিরোজপুর মহিলা কলেজের বাংলার অধ্যাপিকা, ওর হাজব্যান্ড উকিল। মেজ মেয়ে বিএসসি পাস করে ঢাকায় আছে, ওর হাজব্যান্ড মেজর। ছোট মেয়ে- রোকসানা আহমেদও খুব ভালো ছবি আঁকে- শংকর পুরস্কার পেয়েছে।

ক্লাস এইট পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে, ডিফ অ্যান্ড ডাম্প স্কুলে- ও আবার বোবা, কথা বলতে পারে না।

- আপনার সব ছেলেমেয়েই প্রতিভাবান এবং সমাজে সুপরিচিত- এ জন্য আপনার কি গর্ব হয়?

- অবশ্যই।

- এঁদের এ সাফল্যের পেছনে আপনার কী অবদান আছে বলে মনে করেন?

- না, আমার কোনো অবদান নেই। ওরাই ওদের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে।

- আচ্ছা, আপনার বড় ছেলে হুমায়ূন আহমেদ ছোটবেলায় কেমন ছিলেন?

- ও খুব চালাক ছিল। কথা বলত বুড়ো লোকের মতো এবং সে বুঝতও অনেক বেশি। তা ছাড়া লেখাপড়ায় ও অত্যন্ত ভালো ছিল। ক্লাস এইটে বৃত্তি পেয়েছিল, ম্যাট্রিকে সেকেন্ড স্ট্যান্ড করেছিল। ওর বাবা ওর সব কাগজপত্র জমিয়ে রাখতেন ফাইলের ভেতর। যে কাগজগুলোতে ওর ছবি উঠেছিল, ওর নাম উঠেছিল সে কাগজগুলো আমার কাছে এখনও আছে। ওর বাবা বলতেন, ওগুলো আলমারির মধ্যে যত্ন করে রেখো, তোমার ছেলে একদিন খুব বিখ্যাত হবে, তখন কাগজের লোকরা এসব খুঁজতে আসবে।

- হুমায়ূন আহমেদ যে একদিন লেখকই হবেন- এটা আপনারা বুঝতে পেরেছিলেন?

- ওর বাবা বুঝেছিলেন।

- কিভাবে?

- ও তখন ঢাকায় চলে এসেছে- মহসীন হলের ছাত্র। একবার একটা উপন্যাস লিখে আনল। সম্ভবত 'শঙ্খনীল কারাগার'। বাসার সবাই আমরা পড়লাম- কিন্তু তার বাবাকে পড়ানোর সাহস তার ছিল না। একদিন আমাকে দিয়ে সে লেখাটি তার বাবার কাছে পাঠাল। তারপর- আমার পাশ দিয়ে শুধু ঘুর ঘুর করে অর্থাৎ জানতে চায় তার বাপ এটা পড়ে কি বললেন। এ রকম দু-এক দিন যাবার পর এক রাতে সবাই যখন শুয়ে গেছে তখন তার বাবা তাকে ডাকলেন। খুব ভয়ে ভয়ে সে গেল। আমিও তখন ছিলাম। তার বাপ পাণ্ডুলিপিটা তার হাতে দিয়ে বললেন- 'এটা যত্ন করে রেখে দিস। তুই একদিন খুব নামকরা লেখক হবি।'

- তাঁর বাবা কি তাঁর প্রকাশিত কোনো লেখা পড়েছেন?

- না, উনি তো একাত্তরে স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদ হলেন।

- হুমায়ূন আহমেদের লেখা আপনার কেমন লাগে?

- খুব ভালো। মনেই হয় না যে এটা ও লিখেছে। মনে হয় অন্য কেউ সম্ভবত।

- কোনোটা খারাপ লাগেনি?

- না।

- আচ্ছা, তাঁর কোন গল্প-উপন্যাস কিংবা নাটকের 'মা'-এর চরিত্রে আপনার চরিত্র কিংবা তার খণ্ডাংশ এসেছে বলে আপনার মনে হয়?

- কি জানি (হেসে)। আমার চরিত্র তো আমি বুঝতে পারি না, তবে 'এই সব দিন রাত্রি'র সেই মা নাকি আমি- তো এটা অনেকেই বলেন। আমার তো মনে হয় না।

- আপনার চোখে হুমায়ূন আহমেদকে কী মনে হয়- একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, নাকি লেখক?

- লেখকটাই বেশি।

- তাঁর চরিত্রে একটা দোষের কথা বলুন।

- সে রাগে খুব বেশি। আবার রাগ থাকেও না বেশি সময়।

- তাঁর ছোটবেলার একটা ঘটনার কথা বলুন।

- আমরা তখন সিলেট মীরাবাজারে ছিলাম। আমাদের বাসার পাশেই ছিল গরুর ঘর। একদিন রাতে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলে কি- মা, শুনে যাও, গরুরা কথা বলে। সে কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে বলে যে গরুর কথা সে শোনে- এটা ওর পাগলামি, না অন্য কিছু, কিছুই বোঝা যায় না।

- আপনার সব ছেলেমেয়ের উপর কি আপনি সন্তুষ্ট?

- অবশ্যই।

স্ত্রীর সাথে হুমায়ূন আহমেদই সুযোগ দিলেন কথা বলার। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর নাতনি গুলতেকিন আহমেদ। হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস 'শঙ্খনীল কারাগার' পড়ার পর ক্লাস এইটের ছাত্রী গুলতেকিন আহমেদ একটা চিঠি লেখেন ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ প্রভাষক হুমায়ূন আহমেদের কাছে। এরপর দেখা হয়। যোগাযোগ বাড়ে। ঘনিষ্ঠতার পরিণতিতে গুলতেকিন ১৯৭৬ সালে এসএসসি পাস করার পর হুমায়ূন আহমেদের ঘরণী হয়ে আসেন। তিন মেয়ে নোভা, শিলা আর বিপাশার মা- নিজেই মেয়েদের দায়িত্ব নেন। এদের নিয়ে তাঁর কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই। যে যা হতে পারে হবে।

তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম- আচ্ছা, আপনি বিয়ের আগে যখন হুমায়ূন আহমেদের 'নন্দিত নরক' কিংবা 'শঙ্খনীল কারাগার' পড়লেন তখন কি ও দুটোকে লেখকের আত্মজীবনীমূলক কিছু বলে মনে করতেন?

- কিছুটা মনে হতো।

- নন্দিত নরকের 'খোশ' নিভৃতভাবে একটা মেয়েকে ভালোবাসতো। সেই ভালোবাসা সে কোনো দিন মেয়েটিকে জানাবার সাহস পায়নি- তার ভালোবাসা আজীবন নিভৃতেই থেকে গেল। আচ্ছা সেই খোকাটির জন্য কি এখন আমার দুঃখ হতো? (হুমায়ূন আহমেদ তখন মিটমিট করে হাসছেন)

- তা তো হতো।

- বিয়ের পরও যদি কোনো নায়িকার প্রতি লেখকের অতিরিক্ত অনুভূতি দেখা দিত- আপনি কী করতেন?

- ওটা তো গল্পই। আর সত্যি সত্যি সে কিছু করলে তো খারাপ লাগতই।

- আচ্ছা, তাঁর (হুমায়ূন আহমেদের) কোনো এক গল্প-উপন্যাসে আপনার কোনো চরিত্র এসেছিল?

- খণ্ড খণ্ড এসেছে, পুরোপুরিভাবে নয়। [হুমায়ূন আহমেদ জবাব দিলেন, 'এই সব দিন রাত্রি'তে নীলুর চরিত্রের সাথে ওর অনেক মিল ছিল]

- আচ্ছা, লেখালেখির ব্যাপারে আপনি হুমায়ূন আহমেদকে কিভাবে সহযোগিতা করেন?

- কখনো চা বানিয়ে দিই। তা ছাড়া ও লেখার সময় প্রচুর বানান ভুল করে, সেগুলোও ঠিক করে দিই।

- তাঁকে নিয়ে আপনার গর্ব হয়?

- কিছুটা তো হয়ই।

- আচ্ছা, মনে করুন একদিন এমন হলো যে তাঁর লেখা কেউ আর পড়ছে না- তখন আপনার মানসিক অবস্থা কেমন হবে?

- তখন যদি ও লেখা ছেড়ে সংসারের দিকে কিছুটা মন দেয়, তাহলে ভালোই হবে।

- একজন পাঠক হিসেবে তাঁর লেখা আপনার কেমন লাগে?

- ওর লেখা আমার সব সময়ই ভালো লাগে।

হুমায়ূন আহমেদ প্রচুর চা খান। দুবার চা খাওয়ালেন আমাদের। বিদায় নিয়ে আসার সময় বাবুকে আর আমাকে তাঁর দুটো সর্বশেষ প্রকাশিত বই (প্রথম প্রহরে) উপহার দিলেন। হাঁটতে হাঁটতেও কথা হলো কিছুটা। বললেন, উপন্যাস লেখার ব্যাপারে তিনি যেসব এক্সপিরিমেন্ট চালিয়েছেন, এর সবটিই সার্থক। এ টেকনিক আবার সবাই ধরতে পারবেন না। যাঁরা উপন্যাস লেখেন, কেবল তাঁরাই পারবেন।

হুমায়ূন আহমেদ এখন 'এই সব দিন রাত্রি' নিয়ে উপন্যাস লেখায় ব্যস্ত। প্রতিদিন বিশ পৃষ্ঠা লেখেন আর বিশ পৃষ্ঠা প্রেসে দেন।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় একটা রাস্তা দুদিকে চলে গেল। অত্যন্ত অমায়িক ভঙ্গিতে বিদায় দিয়ে আমাদের অনিন্দ্য প্রকাশনীর পথ ধরলেন তিনি। আমরাও রিকশা খুঁজতে ব্যস্ত হলাম। চোখের আড়াল হতে হতে হুমায়ূন আহমেদকে ভালো করে আবার দেখে নিলাম। আমার ভেতরে তখন নজরুল ইসলামের গান বাজছে-

- 'তুমি কেমন করে গান কর হে কবি?'

এতক্ষণে লেখক শিবির পুরস্কার, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, অলঞ্চ সাহিত্য পুরস্কার আর ওসমানী স্মৃতি পদক প্রাপ্ত বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় (বর্তমানে) ঔপন্যাসিক অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

ছড়া

# হিমুর শোকে লক্ষ হিমু কাঁদে

মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম ☙ *জন্ম ডিসেম্বর ৪ .; লক্ষ্মীপুর, পড়াশুনা(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) গনযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা .; কাজ বাংলাদেশ : ব্যাংক, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, পদ পরিচালক-উপ .; বিয়ে হ্যাঁ .; সন্তান টিভি নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখা :তাও একখান সখ : এক কন্যা স্ত্রী .; নিত্য সঙ্গী ছড়া .; ভালোবাসা কবিতা .; আত্মার খাদ্য সঙ্গীত। :*

হলদে রঙের পাঞ্জাবিটা গায়ে
ভর দুপুরে হাটে খালি পায়ে,
পার্কে বসে কাটে সারাবেলা-
হিমুটা না দারুন আত্মভোলা-সবকিছুতে বেদম রসিকতা!
খেলার ছলে বলে গভীর কথা,
দাড়ির ফাঁকে হাসে মিটিমিটি-
চাঁদনী রাতে পড়ে রূপার চিঠি।রাস্তা ঘাটে ঘোরে মহাপুরুষ
হৃদয় পটে আঁকে কাতর মানুষ!
বাসে ভালো জোস্না এবং কাক-
থাক সে কথা, গল্প হয়েই থাক।
হিমুর এখন মেঘের ওপর বাড়ি,
জোস্না ধোয়া চাঁদের সাথে আড়ি;
হিমু কি ঐ ধুসর জগত থেকে
এই নগরের খাঁ খাঁ দুপুর দ্যাখে!
কত্তো মানুষ এই শহরে থাকে-
হিমুর স্মৃতি কেইবা মনে রাখে!
কেউ কি জানে হলদে সোনা রোদে
হিমুর শোকে লক্ষ হিমু কাঁদে!

মন্তব্য থেকে

*শ্যাম পুলকঃ অস্বাধারন কবিতা। কত ভাল লাগল ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। অনেক অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনেকে এত সুন্দর কবিতা আমাদের উপহার দেয়ার জন্যে।*

*এ হুসাইন মিন্টুঃ হিমুকে নিয়ে সুন্দর লিখেছেন, হিমু কি দনিরে বেলায় হাটাহাটি করত না রাতে ?*

*ফিদাতো মিশকাঃ ভালো লাগল । হিমুকে নিয়ে লেখা কবিতা বোধহয় এই প্রথম পড়লাম*

*আমির হোসেনঃ হিমু আমার প্রিয় চরিত্র। ভাল লাগাটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।*

*ফিদাতো মিশকাঃ সুন্দর । ভালো লাগল ।*

*কাউছার আলমঃ হিমু খুবই প্রিয় চরিত্র এটি আমরা সবাই মিস করছি।*

রসরচনা

# আমাদের ফেলুবাবু

সপ্নিল রায়

অবশেষে আমাদের ফেলু বাবু পাশ করিয়া ফেলিল । তাও আবার শুধুমাত্র পাশ ! একেবারে মেডেল সহকারে। আজিকালকার যুগে পাশ করা আর এমন কি। কিন্তু ফেলু বাবু বলিয়া কথা ! এই ফেলু বলিতে কিন্তু আপনারা আবার সেই গোয়েন্দা ফেলুদা ধরিয়া বসবেন না । ইহার মাথা ঐ গোয়েন্দার ধার কাছ দিয়েও যায় না । বলা চলে কিছু প্রাণীর মাথার সাথে তুলনা করা চলে । ফেলুবাবু এহেন ফলাফল করাতে গ্রাম জুড়ে একটা হৈ চৈ পরে গেলো এবং আমরা যারা প্রথম শ্রেণীর ছাত্র বলিয়া এতদিন গণ্য হইতাম তাদের লোকজন কেমন একটা সন্দেহর চোখে দেখিতে লাগিল । এর অবশ্য কারণ আছে যেখানে ফেলুর মতো গবর গণেশ মেডেল পায় সেখানে আমরা কিনা সাধারন পাশ! মোটামুটি চারিদিকে ছি ছি পড়িয়া গেলো । ফেলুবাবুর গর্ভধারিণী গ্রামময় প্রচার করে বেড়াল যে তাহার সন্তানটিকে এতদিন পাড়ার মানুষে নষ্ট করিয়াছিল এবং তিনি অনেক তাবিজ কবচ সহকারে তাহার সুপুত্রকে এই বিষ দৃষ্টি হইতে মুক্ত করিয়াছেন । যার ফল হিসেবে এই ভালো ফলাফল । ফেলুর রেজাল্ট শুনে প্রথমে আমার , পরে গণেশের আর কার্তিকের চোখ প্রথমে ছানাবড়া এবং পরে ওর মার্ক হাতে পেয়ে সবার চোখ কপালে উঠে গেলো । আর ফেলু দা? সে এমন ভাব করিয়া গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল যেন ইচ্ছা করিয়া আমাদের এতদিন ছাড়িয়া দিয়াছে । আসলে তাহার আই কিউ কোন নামকরা বিজ্ঞানীর কাছাকাছি । আপনারা হয়তো জানেন না এ সেই ফেলুবাবু যে ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনে প্রমোশন পাইবার জন্য বছর তিনেক জোর চেষ্টা চালাইয়াছে এবং আমরা তখন ক্লাস থ্রি । আমরা যখন ক্লাস ফোরে তখনো তিনি সেই সিক্স । এরপর আমরা প্রাইমারীর সর্বশেষ ধাপ ফাইভে উঠে গেলাম সেবারও ফেলুদা মন খারাপ করে সিক্সেই থেকে গেলো । এবং এই গ্রামের মানুষই তাহার নাম বদল করিয়া ফেলু রাখিয়া দিলো । অতএব নিয়ম মতো

আমরা ফেলুবাবুর সহপাঠী হইয়া গেলাম। তাহাকে নিয়া মাঝে মাঝেই হাসাহাসি করিতাম তবে কোন দিন মুখ খুলিয়া কোনোদিন একটা শব্দ উচ্চারন করেন নাই।

এহেন ভরাডুবির পর আমরা আর স্থির হইয়া বসিতে পারিলাম না। আমি , গণেশ আর কার্ত্তিক ছুটিলাম তার বাড়ি। পৌঁছে দেখি ফেলুবাবু হাসি হাসি মুখ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া আছেন। আমাদের সমাদরে বসাইলেন। আমাদের তখন তাহার গোপন রহস্য জানিবার দুর্নিবার আখাঙ্খা চাপিয়া বসিয়াছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞেস করলাম ফেলুদা তোমার ফলাফলের পেছনে কি এমন ইতিহাস আছে যে একেবারে আমাদের ছাড়িয়ে গেলে। প্রথমে ফেলুদা একটু আমতা আমতা করলো কিন্তু আমাদের পিড়াপীড়িতে আর থাকিতে না পারিয়া রাজ্যর দেবদেবীর দোহাই দিয়া গোপন কথা বলিতে সম্মত হইলেন। তোদের মনে আছে পরীক্ষা শুরু হইবার দিন পনের আগে একদিন স্কুলে চোর চোর রব উঠেছিলো। আমরা বলিলাম মনে আছে। মনে হইলো পরীক্ষা শুরুর পনেরো দিন স্কুলে গিয়ে শোনে চোর ঢুকেছিল হেডমাস্টারমশাইয়ের রুমে। তবে কিছু খোয়া যায়নি। ফলে বিষয়টা কয়েকদিনেই চুপচাপ হয়ে যায়। সেদিন আমিই ঢুকেছিলাম। দারোয়ানকে কড়া নেশা খাইয়ে আমি প্রশ্নপত্র চুরি করেছিলাম। যার ফলে আমি মেডেল পেলাম আর তোরা। আর একটা প্রশ্ন ফেলু দা। ফেলুদা উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। চাবি কোথায় পেলেন। তোরা মনে করে দেখ এই চাবিও কয়েকদিন আগেই হারিয়েছিল। চুরির পরের দিন আবার সেটা ফেরত পাওয়া যায় হেড মাস্টারের টেবিলের তলায়। আমরা তখন ফেলুবাবুকে আর কিছুই জিজ্ঞেস করিলাম না। তবে সাহসের প্রসংশা করা করিতে ভুলিলাম না।

মন্তব্য থেকে

*কাউছার আলমঃ মনে হয় কিছু মিছ হল।*
*আমির হোসেনঃ মনে হল রসরচনাটি শেষ হয়নি।*
*এ হুসাইন মিন্টুঃ লেখাটি অনেক ভালো লাগল।*
*আহমেদ ইশতিয়াকঃ মধ্যে মধ্যে কিছু শব্দ সাধু ভাষা হতে চলিত ভাষায় চলে গেছে। সাধু চলিতের মিশ্রণ কিন্তু আসলেই দৃষ্টিকটু লাগে। এতটুকু বাদ দিলে লেখাটি ভালো হয়েছে। শুভেচ্ছা...*

বিজ্ঞান কল্পকাহিনী

## ঈশ্বরীয় আবেশ

মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক খান ✍ *লেখালেখি আমার শুধু শখই না, মনে হয় যেন রক্তের টান। বিশেষ করে বিজ্ঞান- কল্পকাহিনি। বিজ্ঞান- কল্পকাহিনি আমার কাছে রঙ্গিন ঘুড়ির মত। কল্পনার সীমানা পেরিয়ে যে ছুটে চলে মহাজগতিক পরিমণ্ডলে। এ যেন সময়টাকে স্থির করে দিয়ে এর আদি- অন্ত দেখার মত। তারপরও এ ঘুড়ি যেমন ইচ্ছে তেমন উড়তে পারে না, সুতোয়ে টান পড়ে বলে। এ টান যুক্তির টান। যৌক্তিক কল্পনা বললে ভুল হয় না। তারপরও নিজ ইচ্ছেয়ে সুতোটাকে ছিঁড়ে দিতে ভাল লাগে মাঝে মাঝে। আমি যেমন নিজে স্বপ্ন দেখি তেমনি সবাইকে স্বপ্ন দেখাতে চাই। অঞ্জন দত্তের ভাষায় বলতে হয়, 'মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যখন- তখন কান্না পায়, তবু স্বপ্ন দেখার এই প্রবল ইচ্ছাটা কিছুতেই মরবার নয়।' কনফুসিয়াসের এই লাইন টা আমাকে খুব টানে... journey of a thousand miles begins with a single step। আমার প্রথম লেখা প্রকাশ হয় ১৯৯৬ সালে আধুনালুপ্ত বিজ্ঞান সাপ্তাহিক আহরহ তে।*

মহাশূন্যযানের সবাই এই মূহুর্তে কন্টোলরুমের বিশাল স্ক্রীনের সামনে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে বললে ভুল বলা হবে। তারা আসলে অবাক বিস্ময়ে খুঁজছে।

'সিসি আমরা তো কালো অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখছি না। তুমি কি কোন বিশেষত্ব খুজে পেয়েছ? মহাকাশযানের দলপতি পদার্থবিদ কাউরী কেন্দ্রীয় কম্পিউটার সিসি'র কাছে জানতে চান।

'আপাত দৃষ্টিতে বিশেষত্ব চোখে না পড়লেও মহামান্য কাউরী ইতিমধ্যে আমাদের মহাকাশযানের গতিবেগ শূন্য হয়ে গেছে। আমরা আর সামনে এগুতে পাছি না। কোন একটি বিশাল শক্তি আমাদের বিকর্ষণ করছে।'

পদার্থবিদ লীহা বলে ওঠেন. 'তাহলে কি রুনের হাইপোথিসিস এর প্রথম অংশ সত্যি প্রমাণিত হতে যাচ্ছে।'

'প্রচন্ড বিকর্ষণশক্তির জন্য তুমি হুট করেই রায় দিতে পার না যে রুনের হাইপোথিসিস এর প্রথম অংশ সত্যি।' কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অধ্যাপক ত্রিনা বলেন।

'তোমার কি মনে আছে বছর খানেক আগে আমরা লী ৮০২ গ্যালাক্সীতে এরকম এক প্রচন্ড বিকর্ষনের পাল্লায় পড়েছিলাম। সেটা ছিল ঐ গ্যালাক্সীর কেন্দ্রীভূত আন্তঃশক্তির বিকিরণ।' অধ্যাপক ত্রিনা পদার্থবিদ লীহার উদ্দেশ্যে বলেন।

'কিন্তু স্যার আমরাতো এই মূহুর্তে কোন গ্যালাক্সীর ভিতরে নেই। হিসেব অনুযায়ী আমরা মহাবিশ্বের প্রান্তসীমানায় অবস্থান করছি। আর আমরা এসেছি রুনের হাইপোথিসিস এর বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করতে।' লীহা জবাব দেয়।

দলপতি কাউরী মহাকাশযানের কেন্দ্রীয় কম্পিউটার সিসিকে বলেন, 'সিসি তুমি যেসব বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ পাঠিয়েছ সেসব কি সামনে যেতে পেরেছে?'

'হ্যাঁ মহামান্য কাউরী।'

'তাহলে আমরা পারছি না কেন?'

'একটা প্রচন্ড শক্তি আমাদের বাঁধা দিচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার যে আমাদের ধাক্কা দিয়ে পিছনে ফেলে দিচ্ছে না।'

পদার্থবিদ লীহা বলেন, 'তাহলে আমাদের এখন চার্জ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।'

কেউ কোন কথা বলে না। লীহা বুঝতে পারেন সবার সম্মতি আছে। তিনি সিসিকে বলেন,' সিসি তুমি কি এইবার টেষ্টক্রাফ্ট দুটো সামনে পাঠাবে?'

রুনের হাইপোথিসিস অনুযায়ী যদি অজ্ঞাত কোন প্রচন্ড বিকর্ষণ শক্তি মহাশূণ্যে আঘাত করে তবে তার ভিতর দিয়ে চার্জ নিরপেক্ষ আধান প্রাবাহিত হতে পারে। আর এই হাইপোথিসিসের উপর ভিত্তি করে দুটো ছোট টেষ্টক্রাফ্ট তৈরী করা হয়েছে যার বহিরাবরণ সম্পূর্ণ চার্জ নিরপেক্ষ আধানের সমন্বয়ে গঠিত।

'আমি এই মাত্র টেষ্টক্রাফ্ট দুটো সামনের দিকে পাঠিয়েছি' সিসি উত্তর দেয়।

সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখতে থাকে যে চার্জ নিরপেক্ষ মহাশূণ্যযান দুটো সামনে যাচ্ছে। আর কন্টোল প্যানেলের স্ক্রীনে একের পর এক ডাটা ভেসে উঠছে। সবাই খুটিয়ে খুটিয়ে সেটা পড়তে থাকে।

'রুনের হাইপোথিসিস অনুযায়ী এই মূহুর্তে যে কোন একটি টেষ্টক্রাফ্ট অদৃশ্য হয়ে যাবে।' দলপতি কাউরী বলেন।

সবাই একদৃষ্টিতে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু সেরকম কোন কিছুই ঘটে না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সবাই যখন একেবারে অধৈর্য্য হয়ে ওঠে ঠিক তখনই একটি টেষ্টক্রাফ্ট অদৃশ্য হয়ে যায় আর অন্য একটি প্রচন্ড গতিতে ফিরে আসতে থাকে।

টেষ্টক্রাফ্ট দুটোর বহিরাবরনের ভিতরে একটিতে ছিল ধনাত্মক আধান অপরটিতে ছিল ঋনাত্মক আধানের আধিক্য।

'কোনটি বিলীন হলো?' লীহা জিজ্ঞেস করেন।

'ধনাত্মক, মহামান্য লীহা।' সিসি উত্তর দেয়।

এবার দলপতি কাউরী বলে চলেন' তাহলে রুনের হাইপোথিসিসের প্রথম অংশ সত্যি।'

অধ্যাপক ত্রিনাও বলে ওঠেন, 'অবিশ্বাস্য।'

'এটাই কি তাহলে মহাবিশ্বেও সীমানার দেয়াল যেটি প্রচন্ড ধনাত্মক আধান দিয়ে তৈরী?' লীহা বলেন।

কেউ উত্তর দেয় না। সবাই মেনে নেয়।

এবার ত্রিনা নিজেই বলে ওঠেন, 'আমাদের পরীক্ষানুযায়ী রুনের হাইপোথিসিসের প্রথমাংশ সত্য। প্রাথমাংশ সত্যি হলে দ্বিতীয় ধাপটাও সত্যি হতে পারে।'

'আমারও মনে হচ্ছে দ্বিতীয় ধাপটাও সত্যি।' দলপতি কাউরী মন্তব্য করেন।

'তাহলে টুইন ইউনিভার্স থিওরীটাও সত্যি! দ্বিতীয় ধাপতো দুইটি মহাবিশ্বেকে সমর্থন করে।' লীহা বলেন।

'সিসি, এখান থেকে মহাবিশ্বের সীমানা দেয়াল যতটুকু দূরত্ব? যে টেষ্টক্রাফ্ট মানুষ বহনে সক্ষম সেটি নিয়ে কি সমানে যাওয়া সম্ভব? ' সিসির কাছে দলপতি কাউরী জানতে চান।

'আমাদের কাছে যতটুকু চার্জ নিরপেক্ষ আধান আছে এতটুকু নিয়ে যেতে পারি। তবে সীমানা দেয়ালের ওপাড়ে কী আছে সে সম্পর্কে আদৌ আমার কাছে কোন তথ্য নেই। আপনারা

ফিরতে পারবো কিনা সে সম্পর্কেও আমি কোন নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। '

'সিসি তুমি ব্যবস্থা নাও। আমরা যাব এরকম একটা সুযোগ হাজার বছরেও আসে না।' দলপতি কাউরী সিসিকে নির্দেশ দেন।

২.

ছয় ঘন্টা পরে সবাই টেষ্টক্রাফ্ট করে বের হয়ে সামনের দিকে এসিয়ে যেতে থাকে। একসময় টেষ্টক্রাফ্টটি একেবারে প্রান্তসীমানায় চলে আসে। টেষ্টক্রাফ্টের মনিটরে একটা হালকা দেয়াল ভেসে ওঠে।

'এটাই তাহলে মহাবিশ্বের বাউন্ডারি।' লীহা মন্তব্য করে।

সিসি বলে ওঠে, 'সীমানা দেয়ালের প্রতি ইঞ্চিতে দু'শ ট্রিলিওন ট্রিলিওন কিলোভোল্ট। আমরা হয়তো কোন বিপদ ছাড়াই সীমানা দেয়ালটা অতিক্রম করতে পারব।'

তারপরে হঠাৎ করেই টেষ্টক্রাফ্টটি সীমানা দেয়াল অতিক্রম করে ফেলে। সবার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

'মহামান্য কাউরী আমরা মহাবিশ্বের বাইরে চলে এসেছি।' সিসি জানান দেয়।

'কিন্তু এটা কোথায়?' বিজ্ঞানী ত্রিনা বলেন। আরও যোগ করেন, 'এটাই কি সেই ঈশ্বরীয় আবেশের এলাকা?'

কেউ জবাব দেয় না। এমন কি সিসিও না।

'সিসি তুমি কি এই জায়গাটা স্ক্যানিং করতে পার?' দলপতি কাউরী জানতে চান।

'স্ক্যানিং এর অনেককিছুই টেষ্টক্রাফ্টে নাই। তারপরও যতটুকু আছে আমি চেষ্টা করছি।'

সবাই অবাক বিস্ময়ে মনিটরে দেখতে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ কিছু একটা ছুটে যেতে থাকে। আলোকচ্ছটার মতো। কিন্তু আলো না।

'মহামান্য কাউরী আমি কিছু তথ্য যোগাড় করতে পেরেছি। রুনের হাইপোথিসিস অনুযায়ী এটা ঈশ্বরীয় আবেশ হতে পারে। আমি এখানে বিপুল পরিমানে ধনাত্মক আধান দেখতে পাচ্ছি। বিশেষ করে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, হাইড্রোজেন। আরও আছে অক্সিজেন আর হিলিয়ামের আধিক্য। মনে হচ্ছে এই মৌলগুলো একটা নির্দিষ্ট চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে মহাবিশ্ব দুটোতে সরবরাহ করা হয়। টুইন ইউনিভার্স এর সত্যতা নিশ্চিত হওয়া গেছে।'

সবাই যেন এরকম কিছুই শোনার অপেক্ষায় ছিল।

বিজ্ঞানী ত্রিনা বলেন, 'তাহলে একই সাথে দুইটা বিগ ব্যাং হয়েছিল আর দুটো মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল!'

'রুনের হাইপোথিসিসের তৃতীয় অংশটুকুও সত্যি!' লীহা বলে।

'এবার ফেরা যাক।' দলপতি কাউরী সিসিকে নির্দেশ দেন।

টেষ্টক্রাফ্ট ফিরতি পথ ধরে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রান্তসীমানা পেড়িয়ে নিজ মহাবিশ্বে ফিরে আসে।

'সিসি, এবার তুমি মূলমহাকাশযানে প্রবেশ করো।' দলপতি কাউরী বলেন।

'মহামান্য কাউরী কোথাও ছোটখাট একটা সমস্যা হয়েছে। আমি মূল মহাকাশযানটি দেখতে পাচ্ছি না।'

কাউরী চমকে ওঠেন, 'বলো কি? ভালো করে স্ক্যানিং করা।'

'না মহামান্য কাউরী কোথাও মহাশূন্যযানটি দেখতে পাচ্ছি না। তবে কাছাকাছি কোথাও থেকে হালকা একটা সিগনাল আসছে।'

'সেটা কিসের?'

'আমাদের মূল মহাকাশযানের কেন্দ্রীয় ব্ল্যাক বক্সের।'

'তারমানে মহাকাশযান ধ্বংস হয়ে গেছে? কীভাবে? '

'মহামান্য কাউরী, আমি একটা সম্ভাবনা অনুমান করছি।'

'কি সেটা?'

'ঈশ্বরীয় আবেশ এলাকা মহাবিশ্বের বাইরে। সেহেতু সেখানে হয়তো সময় পরম স্থির। আমরা যতটুকু সময় ঈশ্বরীয় আবেশের এলাকায় ছিলাম ততক্ষণে এক ট্রিলিয়ন বছর পার হয়ে গেছে। আর সে সময়ই কোন কারণে মহাকাশযান ধ্বংস হয়ে যায়। ব্ল্যাক বক্সটি থেকে যে সিগনাল আসছে সেটি শুরু হয়েছিল এক ট্রিলিয়ন বছর আগে। ব্ল্যাক বক্স এ আমার কিছু স্মৃতি রক্ষিত আছে।'

সবাই হতাশ হয়ে পরে।

ত্রিনা বলেন, 'তোমার কাছে কি ম্যাপিং আছে। আমরা কি ফিরে যেতে পারব?'

'মহামান্য ত্রিনা, আমার কাছে ম্যাপিং আছে কিন্তু পর্যাপ্ত জ্বালানী নাই। আমরা কিছুতেই নিজ গ্রহে ফিরে যেতে পারব না।'

লীহা বলেন, 'আমাদের পরিচিতজনেরা ট্রিলিয়ন বছর আগেই মারা গেছেন। আমার মনে হয় ফিরে না গিয়ে আমরা আবার ঈশ্বরীয় আবেশের এলাকায় যেতে পারি। তারপর চেষ্টা করে দ্বিতীয় মহাবিশ্ব!'

দলপতি কাউরীর দিকে ত্রিনা তাকিয়ে থাকেন। কিছুক্ষন পর দলপতি বলেন, 'হ্যাঁ, দ্বিতীয় মহাবিশ্বে!'

এর কিছুক্ষন পর ছোট মহাকাশযানটিকে আবার ঈশ্বরীয় আবেশের এলাকার দিকে ছুটে চলে।

লক্ষ্য, এবার দ্বিতীয় মহাবিশ্বে!

অলৌকিক গল্প

## দেওগাঁ'য়ের গণকবর

অনিকেত আহমেদ ✉ *আমার আধুনিক পোষাকের নিচে আদিম রক্ত-মাংসের শরীর। অন্দরে তার মন এক, ততোধিক প্রাচীন। তোমাদের ভুলে যাওয়া শ্যাওলা ধরা পথে প্রেম খুঁজি ঘুরে ঘুরে মুসাফির আমি, খুব ইচ্ছে করে হয়ে যাই বেদুইন কবি।*

ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই আমাদের বন্ধুদের মাঝে বেশ দূরত্ব তৈরী হয়। কারন এক সময় যারা খুব কাছাকাছি ছিলাম তারা তখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছি। চাইলেও একসাথে সময় কাটাতে পারিনা।সে কারনেই বোধহয় গৎবাধা ছুটিগুলোতে সবাই যখন একত্র হই তখন তুমুল আড্ডা চলে। সারারাত একসাথে কোন একজনের বাড়িতে বসে চলে আড্ডাবাজি। কখনো সখনো তাস নিয়ে রাত পারি দেই। এমনি এক আড্ডাতে এসেছিলো ছেলেটা। জেমসের(আমার জনৈক বন্ধু) খালাত কিংবা মামাত ভাই। সেদিন ছিল ঘোর অমাবস্যা, আড্ডা সবে জমে উঠেছে। এমন সময় লোডশেডিং। কি আর করা সবাই মিলে ছাদে গেলাম। কিন্তু আড্ডা আর জমেনা। একে তো লোডশেডিং তায় আবার অমাবস্যা নিজের হাতটা আবছাভাবে দেখা যায় কি যায় না। কেউ কাউকে না দেখে কি আর আড্ডা জমে? হঠাৎ কে যেন বলল ভূতের গল্পের আসরের জন্য এর চেয়ে আদর্শ পরিবেশ আর হয়না। সবাই রাজি। কিন্তু দেখা গেল সবাই শ্রোতা হতে আগ্রহী, কথক হতে রাজি নেই কেউ। হঠাৎই জেমসের সেই ভাইটি (তার নামটা ভুলে গেছি। অনেক চেষ্টা করেও আজ মনে করতে পারছিনা) বলল ,আমি একটা ঘটনা বলি আমার নিজের জীবনের ঘটনা। সবাই বাহবা বাহবা করে উঠল। ছেলেটা গল্প শুরু করার পর বুঝলাম গল্পকথক হিসাবে তার কোন জুড়ি নেই। আমি তার জবানীতেই ঘটনাটা লিখছি-

ছোটবেলা থেকেই আমি উৎসবপ্রিয় মানুষ। এখনও শতব্যস্ততার মাঝেও সামাজিক বা পারিবারিক যে কোন উৎসবের গন্ধ পেলেই আমি হাজির হয়ে যাই।যখনকার ঘটনা বলছি, তখন আমি মাত্র এস.এস.সি. পরীক্ষা দিয়েছি। হাতে অফুরন্ত সময় অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিল। কোথায় যাব, কিভাবে এই দীর্ঘ ছুটি কাটাব সেই দুশ্চিন্তায় রাতের ঘুম হারাম হওয়ার দশা। এমন সময় বিনা বসন্তে দখিনা হাওয়া এল সুখবর নিয়ে। খালাতো বোনের বিয়ে। গাট্টি-বোঁচকা বেঁধে বিয়ের সাতদিন আগে হাজির হলাম খালার বাড়ি। খালাদের গ্রামের নাম দেওগাঁ। দেওগাঁ নামটাই কেমন রোমাঞ্চকর। কেমন ভূতুড়ে একটা সোদাগন্ধ যেন লুকিয়ে আছে নামটাতে। একেত দেও-দৈত্যের নামে নাম তাতে আবার গ্রামে রয়েছে একটা গণকবর। একটু ভয় ভয়ই লাগছিল। এখন যদিও ভূতটুতে আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু সেই সময়টায় ভূতের ভয় ছিল ভীষণ। আর কপালটাও এমন গণকবর খালার বাড়ির সাথেই। খালাদের দখিন দুয়ারি ঘর। ঘরের সামনে বিশাল আঙিনা ,আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলে 'খলু'। এই খলুর বামপাশেই সেই গণকবর। ১৯৭১ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মি আর পূর্ব পাকিস্তানের কিছু জানোয়ার মিলে এই গ্রামের প্রায় পঞ্চাশ- ষাটজন নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যা করে এই গণকবরে পুঁতে রাখে।

যাই হোক, বাড়িটাকে বিয়েবাড়ির সাজে সাজাতে টানা চার পাঁচটা দিন হালের বলদের মত খাটলাম। ব্যস্ততার কারণে গণকবরের কথা বা দেওগাঁয়ের দৈত্যদেওদের কথা ভাববার অবকাশ পাইনি। ফলে ভূতের ভয়টা মনে জায়গা পায়নি এই ক'দিন। ঝামেলাটা হল বিয়ের দিন রাতে। সেরাতে বরপক্ষ আর

আমাদের আত্মীয়স্বজন মিলে এত বেশী লোক হল যে আমরা ঘরের ছেলেরা ঘরে শোওয়ার একটু জায়গা পেলাম না। কারণ কাজ-টাজ শেষ করে যখন ঘুমুতে গেছি তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে আর ঘরের খাট পালঙ্ক এমনকি মেঝেতেও ঘুমন্ত মানুষের ভীড়ে তিল ধারনের জায়গা নেই। কাজেই বাড়ির সামনের খলুতে ঘুমানোর আয়োজন করা হল। সব খালাত-মামাত ভাইয়েরা সেখানে শুয়ে পড়লাম। গরমের দিন ছিল কাজেই খোলা আকাশের নিচে ঘুমানোটা বেশ আরামদায়কই হওয়ার কথা। যদিও প্রথমটায় আমি আপত্তি তুলেছিলাম তবে তা যতটা না খোলা আকাশের নিচে শোওয়ার কুণ্ঠাবোধের কারণে তারচেয়ে বেশী পাশের গণকবরের ভয়ে। যাইহোক দয়া-দরুদ পড়ে চোখ বন্ধ করে গণকবরের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। সারাদিনের প্রচণ্ড পরিশ্রমের কারণে খুব দ্রুতই ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষন পরে জানিনা ঘুমটা ভেঙে গেল। প্রথমে বুঝতে পারলাম না কেন ঘুম ভাঙল। তারপরই অনুভব করলাম প্রচণ্ড শীত। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এমন প্রচণ্ড শীত হওয়ার কথা নয়। সময় টময় নিয়ে মাথা ঘামাবার চেষ্টাও করলাম না শুধু বুঝলাম ঘরে যেতে হবে এখানে থাকলে শীতে জমে যাব। পাশে শুয়ে থাকা মামাত ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। ডেকে লাভ নেই জানি। তাই ধাক্কা দিয়ে উঠাব ভেবে উঠে বসলাম। এমনিতেই গণকবরটার দিকে চোখ পড়ল। দেখলাম একটা বাচ্চাছেলে আর দুইটা লোক সেখানে হাঁটছে। গ্রামের মানুষ এমনিতেই ঝোপঝাড়ে প্রাকৃতিক কর্ম সারে আর সেদিন তো বাড়িতে অনেক মানুষ।বিয়ে বাড়িরই কেউ ভেবে আর গুরুত্ব দিলাম না। যদিও একবার তাকিয়েই আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মামাতো ভাইকে ধাক্কাতে শুরু করেছি কিন্তু মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি খোঁচা দিতে লাগল। কোথায় যেন একটা অসংগতি। চোখে পড়েছে কিন্তু মন ধরতে পারছেনা। হঠাৎ অস্বস্তিটা ভয়ে পরিণত হল। কারণ অসংগতিটা আমি ধরতে পেরেছি। প্রচণ্ড ভয়ে চাচ্ছি ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে আবার দুনির্বার এক কৌতুহল আমাকে টানছে সেদিকে। আসলে যা ভাবছি তাই ঘটছে কীনা তা জানার একটা প্রবল ইচ্ছা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, ভয় হার মানল কৌতুহলের কাছে। আমি তাকালাম আবার সেই গণকবরের দিকে। তাকিয়েই আমার সারা শরীর অসার হয়ে গেল। এমন ভয়াবহ দৃশ্য বা ভয়ানক আতঙ্কের মুখোমুখি আমি আগে কখনো হইনি। ছোটবেলায় একবার পুকুরে পড়ে গিয়েছিলাম। নাকে মুখে পানি ঢুকে একাকার অবস্থা। আমার ঠিক সেই ডুবে যাওয়ার মত অনুভূতি হতে লাগল। মনে হল আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিনা। ভয়ে চিৎকার দিতে চাইছিলাম, পেরেছিলাম কি না জানিনা কারণ তার পরপরই জ্ঞান হারিয়ে ফেলি আমি। জ্ঞান ফিরে অনেক জ্বর নিয়ে। এই জ্বর আর মনের ভয় দুটো কাটাতেই আমার অনেক দিন সময় লেগেছিল।

এই পর্যন্ত বলে ছেলেটা থামল। হয়ত দম নেওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা ধৈর্যহীন শ্রোতাগন একযোগে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কী দেখেছিলে?' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে আবার শুরু করল- সেদিন রাতে কী দেখেছিলাম তা কখনই পুরোপুরি মনে করতে পারিনি। ভাসাভাসা যা মনে আছে তা হল- আমি গণকবরটার দিকে তাকিয়ে দেখার পর যে অসংগতিটা মনের মধ্যে খোঁচা মারে তা হল যে দুজন লোক দেখেছি তাদের মাথা নেই শুধু ধড়টা আছে। পরেরবার যখন তাকাই তখন দেখি অনেকগুলো মানুষ সেখানে ঘুরছে। তাদের বেশীরভাগেরই মাথা নেই। কারোকারো মাথা ঘাড়ের সাথে ঝুলে আছে যেন কেও তাদেরকে গরুর মত করে জবাই করেছে। সেখানে কিছু বাচ্চাও ছিল তবে তাদের কারোরই পুরো শরীরটা নেই। অর্ধেকটা আছে। উপর বা নিচের অর্ধেক নয় ডান বা বামের অর্ধেক যেন কেউ তাদেরকে মাঝখান দিয়ে ফেঁড়ে দিয়েছে। এছাড়া আরও অনেক কিছু- অনেক ভয়ংকর কিছু দেখেছিলাম এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত কিন্তু এর বেশী আর কিছু অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারি নি।

এই ঘটনার পর পাঁচ ছয় বছর পেরিয়ে গেছে। এই ছয় বছরে অনেক কিছু শিখেছি জেনেছি। অনেক অবাঞ্চিত ভয় বিশ্বাস মন থেকে দূর হয়েছে। সেদিনের এই ঘটনাকে এখন আমি অনায়াসেই ক্লান্ত মনের হ্যালুসিনেশন বলতে পারতাম, যেহেতু তখন ভূতের ভয় প্রবল ছিল। সেটা পারিনা দুটো প্রশ্নের উত্তর জানা নেই বলে।

এক. জায়গাটা হঠাৎ করে এত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল কেন??

দুই. গণকবরের মৃতদের কথা উঠলেই গুলি খেয়ে মারা যাওয়া একদল মানুষের অর্ধগলিত লাশের ছবি চোখে ভাসে। হ্যালুসিনেশনেও তেমন কিছুই দেখার কথা। অথচ আমি দেখেছি জবাই করা মানুষ। যদিও আমি এই ঘটনার আগে জানতামই না ওই গণকবরে যাদের পুঁতে রাখা হয়েছে তাদেরকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছিল। আর ছোট বাচ্চাদের দুই পা দু'দিক থেকে টেনে মাঝখান দিয়ে ফেঁড়ে ফেলা হয়েছিল। আমার মন যা জানতই না তা হ্যালুসিনেশন দেখা কি সম্ভব??

সেদিন যা দেখেছিলাম তা সত্যি দেখেছিলাম না কি হ্যালুসিনেসন ছিল জানি না। তোমাদের যা মনে হয় ভেবে নিও। ঘটনাটা আমাদের মধ্যে কয়জন বিশ্বাস করেছিল আর কয়জন বিশ্বাস করেনি তা জানিনা তবে এটুকু মনে আছে ছেলেটা গল্প শেষ করার পর কেউ আর এক সেকেন্ডও ছাদে থাকতে রাজি ছিলনা।

মন্তব্য থেকে

*আজিম হোসেন আকাশ: বেশ ভাল লাগল।*

*আমির হোসেন: ছোট ছোট প্রাণ, ছোট ছোট কথা এরই নাম ছোট গল্প। মজা পাইলাম।*

*সম্পাদক: অনিকেত ভাই, আপনার লেখাটি আকর্ষণীয়। আপনি এই ধরনের আরও কিছু লেখা লিখবেন আশা রাখি।*

*আমির হোসেন: আপনার কাছ থেকে এ ধরনের গল্প আরো আশা করি।*

গল্প

## চোখের কোনে জল

তৌহিদ উল্ল্যাহ শাকিল ✉ *সময় বইয়ে যায়।আমি ও বেড়ে উঠি. নিশ্চিত জীবনের পথ খুঁজে ফিরি কিন্তু অস্থির অবস্থা সে পথ ভুলিয়ে দেয়।কোলাহল ব্যাস্ততা ছেড়ে মনের আনন্দে লিখি।যশ খ্যাতি এসবের পেছনে কখনো ছুটে চলিনি আর চলোতে ও চাই না।বাবার মৃত্যুর পর মা আর ভাই বোন নিয়া ছোট সংসারের দায়িত বয়ে নিয়ে চলছি।গেল বছর জীবনে রং লেগে একজন দুইজনে হয়ে গেছি তাই সকলের দোয়া সুখী জীবনের জন্য।*

আঁধার রাত। আকাশে ক্ষণে ক্ষণে বিজলী চমকাচ্ছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। গ্রামের মেঠো পথ ভিজে পিচ্ছিল।নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে রাস্তায় পথচলা বেশ কষ্টের । তবু এই ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে দুইজন মানুষ পথ চলছে। এদের একজন বয়স্ক অন্যজন নেহায়েত বাচ্চা । বয়স্কজন মাথায় ছাতা ধরে আছে, পরনের লুঙ্গী গুটিয়ে হাঁটু পর্যন্ত তোলা। মাথার ছাতা আসলে কোন কাজে আসছে না । তেরছাভাবে বৃষ্টিপাতের ফলে নিজেকে তো রক্ষা করতে পারছে না , সাথের ছেলেটিকে ও নয়। তাদের সামান্য সামনে একটি রিক্সা । সেই রিক্সায় একজন যাত্রী আছে । রিক্সাওয়ালা ও পায়ে হেঁটে রিক্সা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় দুইজনের মাঝে ছেলেটি প্রশ্ন করল

‘বাবা নানার বাড়ি আর কতদূর’?

‘এইতো বাপ আর বেশীদূর না’।

‘নানা কখন মারা গেছে বাবা’।

‘আজ দুপুরের পর কোন একসময়, আমি অফিসে ছিলাম , তোর মামা এসে বলেছে’।

‘হুম, আম্মুকে বলেছ’?

‘না , বলিনি তবে তোর আম্মু মনে হয় বুঝতে পেরেছে, দেখছিস না মাঝে মাঝে রিক্সা থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে’।

‘হ্যাঁ , শুনতে পাচ্ছি।বাবা নানুভাইকে কি কবর দিয়ে ফেলেছে’?

‘না এখন ও দেয়নি, আমরা যাবার পর দেবে’।

‘আচ্ছা বাবা তোমার কি মন খারাপ করছে, তোমার চোখে জল দেখছি’।

‘না ও কিছু না , মনে হয় বৃষ্টির ছটা পড়েছে’।

অনেকদিন পর বাবার সাথে এভাবে পথ চলছে অন্তু।অন্তুর বাবা ব্যাংকে চাকুরী করে তাই বাবা ছেলের মাঝে সপ্তাহে শুক্রবারের দিন ছাড়া সাক্ষাত হয়না।অন্তুর বাবার নাম আহমেদ।তিনি একটা বেসরকারী ব্যাংকে হিসাবরক্ষক হিসাবে কাজ করেন। বৃহস্পতি বার ছুটির দিনে তিনি পরিবারকে সময় দিতে পারেন । বাকি সময়টা অফিসের ব্যাস্তময় কাজের মধ্যে দিয়ে পার করেন। শুক্রবারের দিনটি অন্তুর কাছে অনেক স্বপ্নের ।বাবার সাথে ক্রিকেট খেলা , বাজারের হোটেলে বসে গরম গরম পরোটা সাথে গরুর মাংসের নেহারী।এরপর এটা সেটা কিনে দেওয়ার আবদার। বাড়িতে ফিরে মায়ের হাতের স্পেশাল রান্না সেই সাথে হইহুল্লোড় সব মিলিয়ে অনাবিল সুখ আর ব্যাস্ততাময় একটি দিন তাদের পরিবারের সকলের জন্য। পরিবার বলতে অন্তু আর তার ছোট ভাই রকিব, একমাত্র বোন বহ্নি আর তাদের মা রুশু,আর আহমেদ সাহেব। সুন্দর মিষ্টি সংসার। সংসারের প্রান কর্তা ব্যাক্তি আহমেদ। অন্তুর মা থেকে শুরু করে সকলেই আহমেদ সাহেবকে সমীহ এবং শ্রদ্ধা করে। আহমেদ সাহেব। রাশভারী মানুষ কথা কম বলেন তবে অন্য আট দশজন মানুষ থেকে তিনি আলাদা। তিনি চলতি সময়ের বিশ্বের সকল খবর রাখেন। সেই কারনে অফিসের বড় কর্তারা অনেক সময়ে কিছু না জানলে আহমেদ সাহেবের শরণাপন্ন হন। আহমেদ সাহেব হাসিমুখে তাদের সমস্যার সমাধান করে দেন। আহমেদ সাহেব একজন সাহিত্যপ্রেমী মানুষ। তিনি নিজে প্রচুর বই পড়েন। তার দেখাদেখি তার বড় ছেলে অন্তু ও ক্লাসের বই ছাড়া ও অনেক বই পড়ে। আহমেদ সাহেব ছেলের উৎসাহ দেখে মনে মনে খুশি কিন্তু খুব সহজে তা তিনি মুখে প্রকাশ করেননা। আহমেদ সাহেব এলাকায় নিজের জায়গায় ছোট একটি পাঠাগার গড়ে তুলেছেন। সেখানে নিজের কেনা বিভিন্ন বিষয়ের বই তিনি রেখেছেন এলাকার জ্ঞান পিপাসু মানুষের জন্য। গ্রামের এই লাইব্রেরি তে তিনি একটি দৈনিক পত্রিকার ও ব্যাবস্থা করেছেন। আহমেদ সাহেবের বড় ভাইয়েরা এইজন্য আহমেদ সাহেব কে অনেক কথা বলেন । আহমেদ সাহেব এসব কথায় কান দেননা।

অন্ত বাবাকে খুব ভালোবাসে । কিন্তু বাবার সামনে গেলে ভয়ে চুপসে যায়। কিন্তু তার বাবা চায় ছেলের সাথে সহজ হতে। কিন্তু সম্পর্কের অন্যরকম একটা দেয়াল দুইজনের সামনে আর দশটা বাবা ছেলের সম্পর্কের মত অনায়াসেই দাড়িয়ে যায়। অন্ত জানে তার বাবা আর আট দশটা বাবার মত নয়। বাবা তাকে যেমন শাসন করে তেমনি অনেক বিষয়ে বন্ধুর মত চলার চেষ্টা করেন। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে আহমেদ সাহেব পাড়ার মাঠে সকলের সাথে মিলে ক্রিকেট খেলেন। সকালে ছেলে অন্তকে নিয়ে মর্নিং ওয়ার্ক করেন। অন্ত'র কাছে তখন পৃথিবীটা অন্যরকম লাগে। ইচ্ছে করে বাবা'কে বলতে বাবা তুমি সবসময়ের জন্য আমার সাথে থেকে যাও ।কিন্তু সে কথা কখন অ বলা হয়না অন্তর।

একদিন রাস্তায় পাড়ার ছেলেরা তাস খেলছিল , অন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই খেলা দেখছিল। অন্তর বাবা রাস্তা দিয়ে যাবার সময় অন্তকে সেখানে দেখতে পায়। তিনি অন্তকে সেখানে কিছু বললেন না ।কিন্তু অন্ত বাড়ি ফিরে এলে তিনি অন্ত'কে বেদম প্রহার করেন। সেই সাথে বলতে থাকেন

'আমি তোকে জন্ম দিয়েছি পাড়ায় আমার বদনাম করার জন্য নয়, এসব তাস(জুয়া) যারা খেলে তারা সমাজের কাছে সবসময়য়ে খারাপ লোক বলে বিবেচিত হয়'।

সেই মার খেয়ে রাতের বেলা অন্তর প্রচন্ড জ্বর হয়। অন্ত'কে তার বাবা রাতে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় কোলে করে সেই রাত ও ছিল ঝড় বাদলের । নিমিষেই অন্ত বাবার মারের কথা ভুলে যায়। বাবার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হবার ইচ্ছে জাগে । সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে অন্তর বাবা অন্তকে ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি নিয়ে আসে। রাতে অন্তর ঘুম লেগে এলে বাবার কান্না শুনতে পায় অন্ত। কিন্তু ইচ্ছে করে আর জাগেনি , বাবার মমতা আর ভালোবাসার কাছে নিজেকে সেই রাত্রে সঁপে দেয়।মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে সমাজে ভালো ছেলে হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে, যাতে করে বাবাকে তার জন্য কোন অপবাদ সইতে না হয়।

২

বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে অন্ত এবং তার বাবা মৃত বাড়িতে প্রবেশ করেন। অন্তর মা রিকশা থেকে নেমে চিৎকার দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে উনার মৃত বাপকে দেখতে পান সাদা কাপনে খাটিয়ার উপর। গগন বিদারী কান্নায় পুরো পাড়া আরো একবার চুপ হয়ে যায় । অন্তর খালামনিরা তার আম্মুকে পেয়ে পুনরায় শোকে মেতে উঠেন। অন্তর কাছে এই দৃশ্য একেবারে অপরিচিত। অন্তকে জড়িয়ে ধরে যখন তার আম্মু এবং খালামনিরা কাঁদতে লাগল তখন তাদের কান্নার প্রভাবে অন্তর চোখে ও জল এসে গেল।

অন্যদিকে অন্তর হাসিখুশি বাবার চোখ রক্তবর্ণ হয়ে আছে। অন্তর বাবা তার নানার খাটিয়ার পাশে বসে আছে মাথায় হাত দিয়ে। সেই সময় ঘরের ভেতর অন্তর আম্মু তার নানা সৃতি স্মরণ করে কেঁদে চলছে । কারো সান্ত্বনা বানী তাকে থামিয়ে রাখতে পারছে না । অন্ত তার আম্মুর অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু তার বোধগম্য হলনা। শুধু মনে হতে লাগল, অন্ত যেমন তার বা্বাকে ভালোবাসে তার আম্মু ও বোধহয় নানুভাইকে তেমি ভালোবাসে।

অন্তর নানার মৃত্যতে অন্ত সবচেয়ে বড় আঘাত পেল যখন তার নানু ভাইকে দাফন করা হল। অন্ত তখন তার বাবাকে জিগ্যেস করল

'বাবা নানু ভাই কি আর আমাদের মাঝে ফিরে আসবে না'।

'না বাবা যে মরে যায় সে আর কখনো এই পৃথিবীতে আর ফিরে আসে না , তার আদেশ উপদেশ গুলো শুধু থাকে তার শরীর আর থাকে না । এই নিয়ম সবার জন্য'।

হঠাৎ করে অন্ত দেখতে পেল তার বাবা সকলের অগোচরে চোখের জল মুছছে।অন্ত দেখে ও না দেখার ভান করল। আজ নিজেকে কেমন যেন বড় মনে হচ্ছে না।যথাসময়ে অন্তর নানার জানাজা হয়ে গেল। এরপর মসজিদের পার্শ্ববর্তি কবরস্থানে উনাকে দাফন করা হল। সকলে দোয়াদুরুদ পড়ে কবরে মাটি দিল। অন্তর কাছে মনে হল এটাই সকলের শেষ ঠিকানা। অন্তর বাবা অন্তকে বলল

'অন্ত এদিকে আস দেখ মানুষ মারা গেলে এভাবে দাফন করা হয়। এটা ইসলামিক নিয়ম, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ নানা নিয়মে এই কাজ করে, কেউ চিতায় আগুন জ্বালিয়ে শরীর ভস্ম করে, কেউ বাক্সে করে মাটির নিচে রাখে।কিন্তু আসল কথা হল মানুষের শরীর হল একটি মিডিয়া, মানুষের রুহ এই মিডিয়াতে যতদিন থাকে ততদিন এই শরীর স্বয়ংক্রিয় ভাবে সবকিছু করতে সক্ষম হয় । আর যখন সেই মিডিয়া থেকে রুহ চলে যায় তখন সব কিছু শুন্য, তখন আর এই শরীরের কোন মুল্য নেই'।

অন্ত বাবার সব কথা বুঝতে পারে না , কিন্তু বিস্ময় ভরা চোখে ফ্যালফ্যাল করে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্তর মনে হচ্ছে তার বাবা আজ অন্যসকল দিনের চেয়ে যেন বেশী কথা বলছে। বাড়ি ফিরে এসে দেখে নানুকে সাদা কাপড় পরানো হয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে অন্ত আবারো বিস্মিত হয়।

৩

পরদিন মৃত বাড়ির নানা আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে অতু এবং তার বাবা রওনা দেয় নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্য। আকাশে ঝলমলে আষাঢ়ের চাঁদ। রুপালী চাদরে যেন ঢেকে দিয়েছে চারপাশ। মাঝে মাঝে বয়ে যাচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস। অন্ত বাবার সাথে রিক্সায় বসে আছে। একসময় নীরবতা ভেঙ্গে অন্তর বাবা অন্তকে বলতে লাগল-

'অন্ত আজ তোমাকে আমার জিবনের অনেক কথা বলব, তুমি মন দিয়ে শুনবে , জীবনে হয়ত আর কোনদিন আজকের মত করে পাব না'।

অন্ত মাথা নেড়ে সায় দিল ।

একে একে অন্তর বাবা বলে যেতে লাগল তার শৈশব জীবন থেকে শুরু করে সকল কাহীনি। অন্তর কাছে এসব কথা একেবারে নতুন । তার বাবার প্রত্যেকটি কথা তাকে মুগ্ধ এবং মোহিত করতে লাগল। একসময় তার বাবা নিজের জীবনের প্রেমের কথা ও বলে গেল বিনা সংকোচে। অন্ত ভাবতে লাগল বাবা এসব বলছে কেন?

'শোন আমার যদি কিছু হয়ে যায় তুমি অবশ্যই তোমার মা এবং ভাই বোনদের কে দেখে রাখবে।আজ তোমাকে এসব বলার উদ্দেশ্য হল , মানুষ মরণশীল । মানুষ কে একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়'।বলে আহমেদ সাহেব থামলেন। গাঁয়ের কাচা রাস্তা দিয়ে রিকশা মন্থর গতিতে চলছে। অন্তর কাছে অন্যরকম লাগছে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে তার বাবার দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে।

'কি হয়েছে বাবা ? তুমি কাঁদছ কেন'।

'আরে কিছু না , চোখে পোকা পড়েছে বোধহয়'।

'না বাবা তুমি কিছু লুকাচ্ছ'।

'নারে কিছু না , আমি না থাকলে তুই পারবি তো সামলে নিতে'।

'জানিনা বাবা,তুমি এমন কথা কেন বলছ'।

'শোন বাবা অন্ত, আমি এখন এমন একটা কথা বলব , আশা করি তুমি ছাড়া আর কাউকে সেই কথাটি বলবে না ।আমার একটা মারাত্নক অসুখ হয়েছে, যা আমি কাউকে বলি নি । যে কোন দিন যে কোন সময়ে আমার মৃত্য হতে পারে । আর সেই কারনে আজ তোমাকে জীবনের অনেক কথা বলে হালকা হলাম'।

'কি বলছ বাবা! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না , কি অসুখ হয়েছে তোমার'।

'আমার ক্যান্সার ধরা পড়েছে আজ মাস তিনিক হল'।

অন্তর সামনে পুরো পৃথিবী অন্ধকার মনে হল। রাতের চাদের আলো অনেক বিষণ্ন মনে হল । মাথা চক্কর মেরে উঠেছে । বাবাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল অন্ত। আহমেদ সাহেব ঢুকরে কেঁদে উঠলেন। অন্তকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন বেশ শক্ত করে।

পরবর্তী কয়েকদিন অন্তকে নানা জায়গায় নিয়ে গেলেন আহমেদ সাহেব। অনেকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কোথায় কি দেনা পাওনা আছে সব বুঝিয়ে দিলেন। ব্যাংকের বড় কর্তাকে সব খুলে বললেন। বড় কর্তা সকল বিষয়ে অন্তকে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। প্রতিদিন ঘরে ফিরে অন্ত নিজের রুমে বসে কাঁদে। অন্যদিকে আহমেদ সাহেব সকলের আড়ালে চোখের জল ফেলেন।

৪

অন্ত স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন সময় একটি টেলিগ্রাফ নিয়ে এল কেউ একজন। তাতে লেখা ছিল

"Mr ahmed in comilla hospital"

টেলিগ্রাফ পেয়ে অন্তর মা কেঁদে কেটে অস্থির। অন্তর আংকেল কে সাথে নিয়ে তার মা হাসপাতালের উদ্দেশ্য রওনা দিলেন । অন্তকে স্কুলে যেতে বারন করে বাড়িতে থাকতে বললেন। অন্তর বুকতা ছ্যাঁত করে উঠল। সে বুঝে গেল কি হতে চলছে। বিকাল পাঁচটার দিকে এ্যাম্বুলেন্সে করে আহমেদ সাহেবের মৃত দেহ নিয়ে আসা হল। অন্তর মা পাথরের মূর্তির মত বসে রইল। তিনি এই মৃত্য কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। অন্তর বোন বহ্নি এবং ছোট ভাই প্রথমে কিছু বুঝতে পারল না কিন্তু যখন দেখল তাদের বাবা বেঁচে নেই , তখন দুইজনে কাঁদতে লাগল। ঘরের বারান্দায় মায়ের পাশে গিয়ে বসল অন্ত। অন্তকে দেখেই তার মায়ের কান্না শুরু হল। সে কান্নায় অন্ত ও মায়ের বুকে মুখ গুজে কেঁদে বুক ভাসাল।

যথারীতি দাফন কাফনের ব্যাবস্থা করা হল। আহমেদ সাহেবের জানাযায় অনেক মানুষ হল। সকলে আহমেদ সাহেবের পরিবারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। অন্ত তখন আর কাদছিল না । তখন তার বার বার মনে হচ্ছিল বাবার কথা গুলো । যা আর কেউ জানেনা । জানে শুধু অন্ত আর তার মৃত বাবা।

অন্ত তার বাবাকে সকলের সাথে মিলে কবরে শুইয়ে দিয়ে মাটি দিয়ে বাড়ির দিকে আসতে লাগল। তার সামনে পড়ে আছে অচেনা এক ভবিষ্যৎ । ভাই বোনের দায়িত্ব , নিজের লেখাপড়া এবং সংসার। অন্ত মাথা তুলে আকাশের দিকে চাইল। আবছা ভাবে দেখতে ফেল তার বাবা তার দিকে চেয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে , যেন বলছে

'হ্যাঁ বাবা তুই পারবি , আমি তো আছি। মানুষ মরে গেলে তার শরীর চলে যায়। তার আদেশ উপদেশ

অনন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে অন্ত মনে মনে বলে উঠল

'হ্যাঁ বাবা আমি পারব, আমাকে পারতেই হবে।তোমাকে দেওয়া ওয়াদা আমি পালন করব নিজের জীবন দিয়ে হলেও'।
বাড়ির সামনে তখন সাদা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে তার মা এবং ভাই বোন।তাদের দৃষ্টি কবরের দিকে , অন্ত তাদের মাঝে গিয়ে দাড়াল এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল।
তার বাবা হাসছে , তবে তার চোখের কোনে জল,যা তিনি লুকানোর চেষ্টা করছেন না।

মন্তব্য থেকে

*আমির হোসেন: ছোট গল্প ভাল লাগল। লিখুন সবসময়। আরো গল্প চাই।*
*আজিম হোসেন আকাশ: ভাল লাগল। লিখুন সবসময়।*
*মিলন বনিক: শাকিল ভাই...খুব ভালো লাগল গল্পটা...মন ছুঁয়ে গেল....*
*মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক খান: এই গল্পটি সেরার তালিকাতে নেবার জন্য আমি চলন্তিকার প্যানেলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।*
*পৃথিবী জুড়ে স্বপ্ন: একটি মন ছুঁয়ে যাওয়া গল্প।*
*শাহরিয়ার সজিব: ভাই আমারও চোখের কোনে জল এসেগেছে । সব মিলিয়ে ভালো হয়েছে ।*

গল্প

## দিবসহীনদের গল্প, ওরফে চেঙ্গু

এ হুসাইন মিন্টু ✍ *পুঁজিবাদের এই জমানায় কলম আমার পুঁজি চেনা মানুষের ভিড়ে আমি অচেনা মুখ খোঁজি,, কলমে ভর করে দাড়ানোর প্রচেষ্টায় রত এক শব্দ শ্রমিক । লেখকের প্রকাশিত বইসমূহঃ- কাব্যগ্রন্থ-জীবন নদীতে খরা উপন্যাস-অশ্রু, নরক ও প্রচ্ছায়া ।*

আমি এখন যে গল্পটি বলব, সেটা নিছক কোনো গল্প নয় । যে জীবনকে ঘিরে প্রতিদিন তৈরী হয় অসংখ্য গল্প, সেই জীবনেরই কয়েক মূহুর্তের কথা । সদ্য গত হওয়া বাবা দিবসে আমি বাড়িতে ছিলাম । আমাদের বাড়ি থেকে চার বাড়ি পেছনে নসিবুদ্দিনের বাড়ি । বাড়ি তো নয় যেন এক ঝুঁপড়ি । মাটির সেঁতসেঁতে দেওযাল, ধানের খড় দিয়ে ছাওয়া ঘরের চাল, এতেই ওদের কষ্টের দিনাতিপাত । ঘর বলতে নসিবুদ্দিনের বাড়িতে এই একটিই । দুই সন্তান, স্ত্রীসহ নসিবুদ্দিনের পরিবারের সদস্য সংখ্যা চারজন । ছোট সন্তান মর্জিনার বয়স চার বছর । বড় সন্তান মতিউর রহমানের বয়স আট বছর । বড়ই অভাবের সংসার নসিবুদ্দিনের । নসিবুদ্দিনের বয়স যখন পনেরো কি ষোল, তখন গ্রামে এসে ছিল মহামারি কলেরা । সেই মহামারিতে নসিবুদ্দিনের দুই ভাই ও বাবা মা গত । সেই থেকেই নসিবুদ্দিন একেলা । জমিজমা বলতে পৈতৃক সূত্রে পাওয়া আট শতাংশ জমির উপর ভিটে বাড়ি খান । নসিবুদ্দিনের স্ত্রী বানেছা বেগম পাশের গ্রামের এক দিন মজুরের ঘরের মেয়ে বলে, স্বামীর সাথে সংসার কর্ম করতে অথবা পাশের বাড়িতে ভাড়া ভানতেও অসুবিধে হয় না তার । বুঝমান হবার পর থেকে নসিবুদ্দিনও পরের বাড়িতেই চুক্তি কাজ করত । জৈষ্ঠ, অগ্রাহায়ন মাস তথা ধান কাটা সিজন এলেই নসিবুদ্দিন বাইক আর কাস্তে নিয়ে চলে যেত টাঙ্গাইলের সখিপুর কিংবা পাহাড়ী এলাকায়, যেখানে মাইনে বেশি পাওয়া যায় ।

আমাদের এখান থেকে সখিপুরের দূরত্ব কত হবে ? নসিবুদ্দিনের বাড়ি থেকে মাইল চারেক হেটে বা ভ্যান রিকশা করে সাগরদিঘী, তারপর সাগরদিঘী থেকে সখিপুরের বাস ভাড়া নয় টাকা । এমনি এক জৈষ্ঠ মাসের শুরুতে কাজের উদ্দেশ্যে নসিবুদ্দিন রওনা হয়ে ছিল সখিপুরে । নয় টাকার ভাড়া পাঁচ টাকায় চুক্তি হওয়ায় বাসের কন্টেক্টর কামলাদেরকে জায়গা দিয়ে ছিল বাসের ছাদে । নসিবুদ্দিন হাউশ করে বাসের ছাদের রেলিং-এর উপর দিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল বাম দিকে মুখ করে । নসিব দোষে কাঁঠাল গাছের ডালের সাথে বাড়ি লেগে ভেঙ্গে গিয়ে ছিল নসিবুদ্দিনের বাম পা । সেই থেকে নসিবুদ্দিন অচল । কত চিকিৎসা করাল পা আর ভালো হল না । প্রথমে কবিরাজি, এই গাছের বাকল, ঐ গাছের পাতা । পরে ডাক্তারি, প্রথমে থানা শহর, পরে জেলা শহর, অবশেষে ঢাকা । নসিবুদ্দিনের পুঁজি বলতে ছিল দুই হাত, পা, আর আট শতাংশ জমির উপরে ভিটে বাড়িখান । অচল পা-এর চিকিৎসা করাতে ভিটে বাড়ির আট শতাংশ থেকে পাঁচ শতাংশ জমিও বিক্রি করতে হয়ে ছিল নসিবুদ্দিনকে । তবুও পা ভালো হল না, অবশেষে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী হাটু পর্যন্ত পা কেটে ফেলে দিলো । পঙ্গু নসিবুদ্দিনও জীবন যুদ্ধের কাছে হার মানে নি, মানলে চলে না । পঙ্গু হয়েছে পা, পেট তো নয় । পেটের আহার চাই-ই চাই । নিজের চাই, সন্তানের চাই, স্ত্রী-র চাই ।

নসিবুদ্দিনের আট বছর বয়সী ছেলে মতিউর রহমান, অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে থাকতে বুকের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, হাত পা শুকিয়ে লেঁকলেঁকে হয়ে চুড়াই পাখির মতো দেখায় বলে আশেপাশের সাবই ওকে চেঙ্গু বলেই ডাকে । চেঙ্গু নামে আপত্তিও নেই ওর, দিব্যি সাড়া দেয় হেসে হেসে । চেঙ্গুর মা বানেছা বেগম মানুষের বাঁশের ঝোঁপ থেকে কঁঞ্চি কেটে আনে । সেই কঁঞ্চি দিয়ে চেঙ্গুর বাবা নসিবুদ্দিন খাঁচা ও টোকরী বুনে । চেঙ্গু সেই খাঁচা, টোকরী বাজারে বিক্রি করে সংসার চালায় । যে বয়সে হাতে থাকবে খাতা, কলম, বই, নসিব দোষে সেই বয়সেই হাতে খাঁচা নিয়ে চেঙ্গু দাড়িয়ে থাকে বাজারের গলিতে ।

বাবা দিবসের দিন বিকেল থেকেই আমাদের এলাকায় থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল । আমি বাজারে গিয়ে আটকে পড়ে ছিলাম চায়ের

দোকানে। রাত আটটার পর বৃষ্টি হঠাত থেমে আকাশ কিছুটা পরিষ্কার হয়ে এল। এই ফাঁকেই আমি রওনা দিলাম বাড়ির দিকে। বাজার থেকে বের হয়ে সামান্য এগুনোর পর আবছা আধারে পাশ দিয়ে একজনকে যেতে দেখেই জিজ্ঞাস করলমা, কে, চেঙ্গু না ?

আমার পাশে থেকে কোমল কণ্ঠটি বলল, জে।

চেঙ্গু মাথায় একটি খাঁচা, খাঁচার মধ্যে একটি পিলিথিনের ব্যাগে কী যেন আরো। আমি জিজ্ঞাস করলাম, চেঙ্গু তোর বাবার শরীর কেমন?

চেঙ্গু বলল, জে ভালাই।

আমরা দুইজন কথা বলতে বলতে হেটে চলছি। চেঙ্গু নিজে থেকে কিছু বলছে না। আমি জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিচ্ছে। মাথায় বোঝা নিয়েও চেঙ্গু আমার চেয়ে দ্রুত গতিতেই পা ফেলছে। খানিক পর আমি ফের জিজ্ঞাস করলাম, তোর মাথায় কি ?

চেঙ্গু বলল, খাঁচা। খাঁচার মধ্যে চাইল আর নোণ।
আমি বললাম, তোর বাবার জন্য বাজার থেকে কিছু আনিস নি ?
চেঙ্গু সহজ স্বরে বলল, বাজানের লাইগা আবার কী আনমু ?
আমি বললাম, আজ যে বাবা দিবস, জানিস ?
চেঙ্গু আবারো সহজ ভঙ্গিতেই বলল, হেইডা আবার কি ?

আমি সংক্ষেপে অর্থাত যেভাবে চেঙ্গুকে বুঝানো সহজ সেভাবেই বললাম, আজকের দিনে সব সন্তানেরাই বাবাদের সাথে সময় কাটায়, বাবাকে শুভেচ্ছা জানায়, পারলে উপহার দেয়।

চেঙ্গু বলল, আমি আবার বাজানরে কী উপহার দিমু ? দুইদিন ধইরা বৃষ্টি, কইঞ্চা কাটবার পাই না বইলা বাজান খাঁচা বানাইতে পারে না। যাও বা দুইডা বানাইছিল বৃষ্টির লাইগা বাজারে একটার বেশি বেচবার পারি নাই। মায় কইছিল, চাইল আনতে, মাছ আনতে, পেয়াজ আনতে। আমি খালি চাইল, নোণ আর মরিচ লইয়া আইছি। আর বাজান রে উপহার দিলেও নিবো না। হে তো ঈদের মধ্যেও নতুন জামা কাপড় কিনে না।

আমি বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাস করলাম, ঈদের মধ্যেও কিনে না, কেন ?

চেঙ্গুর সরল স্বীকারোক্তি, কিনব কেম্নে, খাঁচা বেইচা যা অয়, তা দিয়া তো মর্জিনা আর আমারই অয় না, আবার মা-র লাইগাও কিনতে অয়।

আমি আর কিচ্ছু বলি নি। আমার পা কেমন যেন অসাড় আসছিল। কিছুক্ষণ পর চেঙ্গু চলে গেল নিজের বাড়ি, আমি চলে এলাম আমাদের বাড়িতে। সারা রাত ঘুম হল না। আজকের এই সময়ে এসে সন্তান তার বাবাকে মোবাইলে মেসেজ করে, ফোন করে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, গিফটের সমাহারও কম না। রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা, ব্লগ, ফেইসবুক, ইন্টারনেট, সর্বত্র বাবা দিবসের জয়গান। কেউ কেউ আবার সাজানো গল্প লিখে নিজের বাবাকে সম্রাট শাহজাহান বানিয়ে ফেলছে। কিন্তু এই দেশে এখনো নসিবুদ্দিনের মতো অসংখ্য হতভাগা বাবা, আর চেঙ্গুর মতো অসংখ্য অসহায় সন্তান আছে, যারা জানেই না দিবস কি ? আমরা কি এদের কথা একবার ভেবেছি ? এরা কি আমাদেরই অংশ না, আমরা কি পারব নিজেদের অস্তিত্ব থেকে পালিয়ে বেড়াতে, বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে, পারলেও কতদিন ?

মন্তব্য থেকে
*আরিফুর রহমান: ঠিকই বলেছেন ভাই, গল্পটা শুনে আমার ও খুব খারাপ লাগল। আসলে আমরা সবাইত বাবা দিবসে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পোস্ট করে থাকি। কিন্তু আমাদের পেছনে যে কত গল্প রয়েছে তা আমরা কেউ ভাবার চেষ্টা করি না। আপনাকে সালাম এবং ধন্যবাদ। শুভেচ্ছা রইল। নিয়মিত লিখবেন। আপনার গল্প আমার খুব ভালো লাগে। ভালো থাকবেন।*
*এ হুসাইন মিন্টু: ধন্যবাদ*
*আরিফুর রহমান: আপনাকে ও ধন্যবাদ। চালিয়ে যান। শুভেচ্ছা রইল।*
*তৌহিদ উল্ল্যাহ শাকিল: বেশ ভালো লিখেছেন।জীবন এমনি ? আপনার লেখার হাত ভাল। নিয়মিত লিখবেন আশা রাখি।*
*কাউছার আলম: খুব ভাল হয়েছে। ধন্যবাদ।*

বিজটেনর আসছে ...